হত্যাকারী কে ?

Whip me, ye devils
From the possession of the heavenly sight !
Blow me about in winds ! Roast me in sulphur !
Wash me in steep-down gulf of liquid fire !
O ! Desdemona ! Desdemona ! Dead ! O ! O ! O !

Dodd's Beauties of Shakespare.

পাঁচকড়ি দে

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ছয় আনা

সপ্তম সংস্করণ

সর্ব্বসদ্‌গুণালঙ্কৃতহৃদয়

সুহৃদ্বর

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ শ্রীমানী বি-এ, বি-এল্

বৈবাহিক মহাশয়ের নামে

এই গ্রন্থ

সাদরে

উৎসর্গীকৃত

হইল।

বিজ্ঞাপন

শ্রদ্ধাস্পদ পরমবন্ধু শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সাহিত্যক্ষেত্রে আমার প্রধান সহায়। তাঁহারই সহৃদয়তা ও উৎসাহে আমার পুস্তকগুলি আজ বঙ্গের গৃহে গৃহে পরিচিত। রচনা কিরূপ হৃদয়গ্রাহী, জানি না—কিন্তু যখনই আমার কোন একখানি নূতন পুস্তক বাহির হয়, তিনি খুব আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহার সেই আন্তরিকতা কতদূর যে আমার উৎসাহ বর্দ্ধন করে, তাহা বর্ণনাতীত।

অনেক বিষয়ে আমি তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞ। সেই কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ এই পুস্তকের গ্রন্থস্বত্ব তাঁহাকে প্রদান করিলাম। তাঁহার বিনানুমতিতে কেহ ইহা মুদ্রাঙ্কিত অথবা কোন অংশ উদ্ধৃত করিতে পারিবেন না।

এই গল্পটী প্রথমে সন ১৩০৯ সালে "আরতি" নামক মাসিক পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল।

২৫শে শ্রাবণ,
১৩১০ সাল।

গ্রন্থকার

হত্যাকারী কে?

প্রথমার্দ্ধ

উপক্রমণিকা

আমার কথা

দুইজনেই নীরবে বসিয়া আছি, কাহারও মুখে কথা নাই। তখন রাত অনেক, সুতরাং ধরণীদেবীও আমাদের মত একান্ত নীরব। সেই একান্ত নীরবতার মধ্যে কেবল আমাদিগের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ প্রতিক্ষণে স্পষ্টীকৃত হইতেছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে আমি পকেট হইতে ঘড়ীটা বাহির করিয়া দেখিলাম, "হঃ! রাত একটা!"

আমার মুখে রাত একটা শুনিয়া যোগেশবাবু আমার মুখের দিকে একবার তীব্র দৃষ্টিপাত করিলেন। অনন্তর উঠিয়া একান্ত চিন্তিতের ন্যায় অবনত-মস্তকে গৃহমধ্যে পাদচারণা করিতে লাগিলেন। এইরূপে আরও কিছুক্ষণ কাটিল। হঠাৎ পার্শ্ববর্ত্তী শয্যার উপরে বসিয়া, আমার হাত ধরিয়া যোগেশচন্দ্র ব্যগ্রভাবে বলিতে লাগিলেন—

"আপনার সদয় ব্যবহারে আমি চিরঋণী রহিলাম। আপনার ন্যায় উদার-হৃদয় আর কাহাকেও দেখি নাই। আপনি ইতিপূর্ব্বে অনেক কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন; কিন্তু আমি তাহার যথাযথ উত্তর দিতে পারি নাই; আমার এখনকার অবস্থার কথা একবার ভাবিয়া দেখিলে

আপনি অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন, সেজন্য আমি দোষী নহি। আপনি আমার সম্বন্ধে যে সকল বিষয় জানিবার জন্য একান্ত উৎসুক হইয়াছেন, আমি তাহা আজ অকপটে আপনার নিকটে প্রকাশ করিব, নতুবা আমার হৃদয়ের এ দুর্ব্বহ ভার কিছুতেই কমিবে না। ঘটনাটা যেরূপ জটিল রহস্য-পূর্ণ, শেষ পর্য্যন্ত শুনিতে আপনার অত্যন্ত আগ্রহ হইবেই। আপনি যদি আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি এখনই আরম্ভ করিতে পারি। ঘটনাটার মধ্যে আর কোন নীতি বা হিতোপদেশ না থাক, অক্ষয়বাবু যে একজন নিপুণ ডিটেক্‌টিভ, সে পরিচয় যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। কেহ যদি কখনও কোন বিপদে পড়েন, তিনি যেন অক্ষয় বাবুরই সাহায্য প্রার্থনা করেন। আমার বিশ্বাস, ন্যায়পথে থাকিয়া নিরপেক্ষ ভাবে যথাসময়ে ঠিক কার্য্যোদ্ধার করিবার ক্ষমতা তাঁহার বেশ আছে।”

আমি মুখে যোগেশবাবুকে কিছুই বলিলাম না। মুখ চোখের ভাবে মস্তকান্দোলনে বুঝাইয়া দিলাম তাঁহার কাহিনী আমি তখনই শুনিতে প্রস্তুত, এবং সেজন্য আমার যথেষ্ট আগ্রহ আছে। আরও একটু ভাল হইয়া বসিলাম।

যোগেশচন্দ্র তখন বলিতে আরম্ভ করিলেন।

প্রথম পরিচ্ছেদ

যোগেশচন্দ্রের কথা

কি মনে করিয়া যে আমি তখন অক্ষয়বাবুকে আমার কাজে নিয়োজিত করিয়াছিলাম, সে কথা এখন ঠিক করিয়া বলিতে পারিব না। কতক বা ভয়ে, কতক বা রাগে এবং কতক বা অনুতাপে, তখন আমি কতকটা পাগলের মতনই হইয়া গিয়াছিলাম। যদি আপনি কখনও কাহাকে ভালবাসিয়া থাকেন—প্রকৃত ভালবাসা যাহাকে বলে, যদি আপনি সেইরূপ ভালবাসায় কাহাকে ভালবাসিয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনি বুঝিতে পারিবেন, কি মর্ম্মান্তিক ক্লেশ আমি ভোগ করিতেছি। কি আশ্চর্য্য, আমি এখনও সেই নিদারুণ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া বাঁচিয়া আছি।

আমি বাল্যকাল হইতেই লীলাকে ভালবাসিয়া আসিতেছি। লীলাও আমাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ভালবাসিত; সে ভালবাসার তুলনা হয় না। মরিয়াও কি লীলাকে ভুলিতে পারিব? শৈশবকাল হইতেই শুনিতাম লীলার সহিত আমার বিবাহ হইবে। তখন হৃদয়ের কোন প্রবৃত্তি সজাগ হয় নাই, তথাপি সে কথায় কেমন একটি অজানিত আনন্দ-প্রবাহে সমগ্র হৃদয় উল্লসিত হইয়া উঠিত। তাহার পর বড় হইয়াও সেই ধারণা অটুট ছিল। আমাদিগের আর্থিক অবস্থা তেমন সচ্ছল ছিল না বলিয়া, আমার সহিত লীলার বিবাহে লীলার পিতার কিছু অনিচ্ছা থাকিলেও লীলার মাতার আর তাহার ভ্রাতা নরেন্দ্রনাথের একান্ত আগ্রহ ছিল। নরেন্দ্রনাথ আমার সহাধ্যায়ী বন্ধু। এমন কি, অবশেষে তাঁহাদিগের আগ্রহে লীলার পিতাকেও সম্মত হইতে হইয়াছিল। সুতরাং লীলা যে একদিন আমারই হইবে, এ দৃঢ় বিশ্বাস আমার সমভাবে অক্ষুন্ন ছিল।

এমন সময়ে ডাক্তারের পরামর্শে আমার পীড়িতা মাতাকে লইয়া আমাকে বৈদ্যনাথে যাইতে হয়। পীড়ার উপশম হওয়া দূরে থাক্, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মা বাঁচিলেন না।

মা ভিন্ন সংসারে আমার আর কেহ ছিল না। মাতার সহিত সংসারের সমুদায় বন্ধন আমার শিথিল হইয়া গেল—সমগ্র জগৎ শূন্যময় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। একমাত্র লীলা—সে শূন্যতার মধ্যে—দীনতার মধ্যে—আমার সমগ্র হৃদয়ে অভিনব আশার সঞ্চার করিতে লাগিল।

বৎসরেক পরে দেশে ফিরিয়া শুনিলাম, লীলা নাই—লীলা আমার নাই—তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে—সে তখন অপরের। তাহার চিন্তাও তখন আমার পক্ষে পাপ। এই মর্ম্মভেদী কথা শুনিবার পূর্ব্বে আমার মৃত্যু শ্রেয়ঃ ছিল।

লীলার পিতা এ বিবাহ জোর করিয়া দিয়াছেন, পত্নী-পুত্রের মতামত তাঁহার নিকটে আদৌ গ্রাহ্য হয় নাই।

যাহার সহিত লীলার বিবাহ হইয়াছে, তাহার নাম শশিভূষণ। সে আমার অপরিচিত নহে। তাহার সহিত আমার আগে খুব বন্ধুত্ব ছিল। মাথার উপরে শাসন না থাকায়, নির্দ্দয়-প্রকৃতি পিতৃহীন শশিভূষণের চরিত্র যৌবন-সমাগমে যখন একান্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল, আমি তখন হইতে আর তাহার সহিত মিশিতাম না; হঠাৎ কখনও যদি কোন দিন পথে তাহার সহিত দেখা-সাক্ষাৎ ঘটিত, পরস্পর কুশল-প্রশ্নাদি ছাড়া বন্ধুত্বসূচক কোন বাক্যালাপ ছিল না।

শশিভূষণের বাৎসরিক হাজার-বারশত টাকার একটা আয় ছিল; তাহাতেই এবং প্রতি মাসে কিছু কিছু দেনা করিয়া তাহার সংসার, বাবুয়ানা, বেশ্যা এবং মদ বেশ চলিত। ঘোরতর মদ্যপ বেশ্যানুরক্ত শশিভূষণ এখন লীলার স্বামী।

ক্রমে লোকমুখে বিশেষতঃ লীলার ভাই নরেন্দ্রের মুখে শুনিলাম, লীলার

স্বামী লীলার প্রতি পশুবৎ ব্যবহার করিয়া থাকে ; এমন কি, যে দিন বেশী নেশা করে, সে দিন প্রহার পর্য্যন্ত করে। নরেন্দ্রনাথের সহিত দেখা হইলেই সে প্রতিবারেই বন্ধুভাবে আমার কাছে এই সকল কথার উত্থাপন করিয়া যথেষ্ট অনুতাপ করিত এবং পিতৃনিন্দা নামক মহাপাপে লিপ্ত হইত।

অনুতাপ-দগ্ধ লীলার পিতা এখন ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়াছেন ; সুতরাং তাঁহার অমোঘ একজ্ঞায়িতার শোচনীয় পরিণাম তাঁহাকে দেখিতে হয় নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এইরূপে আর একটা বৎসর অতিবাহিত হইল। লীলার স্বামী শশিভূষণের বাটী লীলার পিতৃগৃহ হইতে অধিক দূর নহে ; এক ঘণ্টায় যাওয়া আসা যায় ; তথাপি শশিভূষণ লীলাকে এ পর্য্যন্ত একবারও পিতৃগৃহে আসিতে দেয় নাই। নরেন্দ্রের মুখে শুনিলাম, লীলারও সে জন্য বিশেষ কোন আগ্রহ ছিল না। পিতার মৃত্যুকালে লীলা একবার মাত্র পিতৃগৃহে আসিবার জন্য তাহার স্বামীর নিকট অত্যন্ত জেদ করিয়াছিল ; কিন্তু দানবচেতার নিকটে তাহা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল। সেই অবধি লীলা আর পিতৃগৃহে আসিবার নাম মুখে আনিত না।

এ বৎসর পূজার সময়ে লীলা একবার পিতৃগৃহে আসিয়াছিল। শারদীয়োৎসবোপলক্ষে নহে, লীলার মার বড় ব্যারাম, তাই সে আসিয়াছিল। মাতার আদেশে এবার নরেন্দ্রনাথ শশিভূষণকে অনেক বুঝাইয়া হাতে-পায়ে ধরিয়া, কাঁদিয়া কাটিয়া ভগিনীকে নিজের বাড়ীতে আনিয়াছিল।

আমি নরেন্দ্রের রুগ্না মাতাকে দেখিবার জন্য যেমন প্রত্যহ তাহাদের বাড়ীতে যাইতাম, সেদিনও তেমনি গিয়াছিলাম। সেখানে আমার আবাল্য অবারিত দ্বার। যখন ইচ্ছা হইত, তখনই যাইতাম ; কোন নির্দ্দিষ্ট সময়-সাপেক্ষ ছিল না। সেদিন যখন যাই, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

সন্ধ্যার পর শুক্লাষ্টমীর কি সুন্দর চন্দ্রোদয় হইয়াছে! জ্যোৎস্না-প্লাবনে নক্ষত্রোজ্জ্বল নির্মেঘ আকাশ কর্পূরকুন্দধবল। অদূরবর্ত্তিনী প্রবহমানা তটিনীর সুমধুর কলগীতি অস্পষ্ট শ্রুত হইতেছিল। সম্মুখস্থ পথ দিয়া কোন যাত্রাদলের বালক "দাসী বলে গুণমণি মনে কি পড়েছে তোমার," গায়িয়া গায়িয়া আপন মনে ফিরিতেছিল। গায়ক বালকের হৃদয়ে কত হর্ষ! কি উদ্দাম আনন্দ-উচ্ছ্বাস! তুষানলদগ্ধ জীবন্মৃত আমি—আমি কি বুঝিব? হৃদয়ে যে নরকাগ্নির স্থাপনা করিয়াছি, তাহা আজীবন ভোগ করিতে হইবে। যেদিকে দৃষ্টিপাত করি, সকলই যেন হাস্যপ্রফুল্ল—উৎফুল্ল চন্দ্র, উৎফুল্ল নক্ষত্রমালা, উৎফুল্ল সমীরণ, উৎফুল্ল আম্রশাখাসীন পাপিয়ার ঝঙ্কৃত মধুর কণ্ঠ, উৎফুল্ল আলোকাম্বরা শোভনা প্রকৃতির চারুমুখ। কেবল আমি—শান্তিশূন্য—আশাশূন্য—কর্ত্তব্যচ্যুত—উদ্দেশ্যহীন কোন দূরদৃষ্ট পথের একমাত্র নিঃসঙ্গ যাত্রী।

বাটীর সম্মুখ-দ্বারেই নরেন্দ্রের সহিত আমার দেখা হইল। তখন সে ডাক্তারের বাড়ী যাইতেছে; সুতরাং তাহার সহিত বিশেষ কোন কথা হইল না।

আমি বাটীর মধ্যে যাইয়া যে ঘরে নরেন্দ্রের মাতা ছিলেন, সেই ঘরের প্রবেশদ্বারে দাঁড়াইলাম। দেখিলাম, রোগশয্যায় নরেন্দ্রের মাতা পড়িয়া আছেন। পার্শ্বে বসিয়া একজন কঙ্কালসর্ব্বস্ব স্ত্রীলোক তাঁহার মস্তকে ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিতেছে। প্রদীপের আলো আসিয়া সেই উপবিষ্টা স্ত্রীলোকের অধিলুলিতাচিবুক, প্রকটগণ্ডাস্থি অরক্তাধর ম্রিয়মাণ মুখের একপার্শ্বে পড়িয়াছে। প্রথমে চিনিতে পারিলাম না। তাহার পর বুঝিলাম—এ সেই লীলা। আজ দুই বৎসরের পরে লীলাকে এই দেখিলাম! যাহা দেখিলাম, তাহা না দেখিলেই ভাল ছিল।

লীলার সেই শরন্মেঘমুক্তচন্দ্রোপম স্মিত মুখমণ্ডল রৌদ্রক্লিষ্ট স্থল-পদ্মের ন্যায় একান্ত বিবর্ণ এবং একান্ত বিষণ্ণ। সেই লাবণ্যোজ্জ্বল দেহলতা নিদাঘসন্তপ্তকুসুমবৎ শ্রীহীন। সেই ফুল্লেন্দীবরতুল্য স্নেহপ্রফুল্ল আকর্ণবিশ্রান্ত

চক্ষু কালিমাঙ্কিত। বিষাদ-বিদীর্ণ হৃদয়ে লীলাকে দেখিতে লাগিলাম— ক্ষণেকে আমার আপাদমস্তক স্বেদাক্ত হইল। কি আশ্চর্য্য, দুই বৎসরে মানুষের এমন ভয়াবক পরিবর্ত্তনও হয়!

মনে মনে ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিলাম, হে করুণাময়! হে অনাথের নাথ! দীনের অবলম্বন, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়! যাহার আশা আমি ত্যাগ করিয়াছি—যাহার চিন্তাতেও আমার আর অধিকার নাই— কেন প্রভু! আবার তাহাকে এ মূর্ত্তিতে আমার সম্মুখে ধরিলে? প্রভো! আমার হৃদয় অসহ্য বেদনাভারে ভাঙিয়া-চুরিয়া যাক্, অবিশ্রান্ত তুষানলে পুড়িয়া থাক্ হইয়া যাক্, ক্ষতি নাই; লীলাকে সুখী কর—তাহার অন্ধকার মুখ হাসিমাখা করিয়া দাও। আমি আর কিছুই চাহি না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আমাকে দেখিতে পাইয়া লীলা মাথায় কাপড় দিল। এবং তাড়াতাড়ি উঠিয়া, জড়সড় হইয়া লজ্জানম্রমুখে যেমন ঘরের বাহির হইতে যাইবে, তাহার ললাটের একপার্শ্বে কবাটের আঘাত লাগিল। লীলা সরিয়া দাঁড়াইল।

আমি কতকটা অপ্রকৃতিস্থভাবে তাহাকে বলিলাম, "লীলা, বসো। তুমি কি আমাকে চিনিতে পার নাই?"

আমার বিশ্বাস—লীলাকে চিনিতে প্রথমে আমার মনে যেমন একটা গোলমাল উপস্থিত হইয়াছিল, সেইরূপ তাহারও কিছু একটা ঘটিয়া থাকিবে। এ লীলা, সে লীলার মত নয় বলিয়া আমার মনে এইরূপ ধারণা হইয়াছিল। যাক্, এমন সময়ে পার্শ্ববর্ত্তী গৃহমধ্যস্থ কোন দুগ্ধপোষ্য শিশুর করুণ ক্রন্দন শ্রুত হইল। লীলা মৃদুনিক্ষিপ্ত শ্বাসে "আস্‌ছি" বলিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল।

আমি চিন্তিত মনে রুগ্নার শয্যার পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলাম। রুগ্না

নিদ্রিতা। অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়াছিলেন, সুতরাং আমি পূর্ব্বে তাহা বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখন কেমন আছেন ?"

তাহাতেই তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। আমাকে দেখিয়াই বসিতে বলিলেন। আমি তাঁহার শয্যার একপার্শ্বে বসিলাম। তাহার পর তিনি বলিতে লাগিলেন, "বড় ভাল নয় বাবা, এ যাত্রা যে রক্ষা পাইবে, এমন বোধ হয় না। নরেন রহিল, লীলা রহিল, উহাদের তুমি দেখিয়ো। আমি জানি, তুমি উহাদের ছোট ভাই-বোনের মত দেখ ; এখন উহাদের আর কেহ রহিল না ; তুমি দেখিয়ো। তুমি উহাদের বড় ভাই।"

আমি বলিলাম, "সেজন্য আমাকে বিশেষ কিছু বলিতে হইবে না। নরেন ও লীলা আমাকে যে বড়দাদার ন্যায় ভক্তি করে, তাহা কি আমি জানি না ? আমি আজীবন তাহাদের মঙ্গল-চেষ্টা করিব। ঈশ্বরের ইচ্ছায় আপনি এখন শীঘ্র আরোগ্য লাভ করিলে সকল দিক্ রক্ষা হয়।"

নরেন্দ্রের মাতা বলিলেন, "না বাবা, আর বাঁচিতে ইচ্ছা নাই। নরেনের জন্য ভাবি না, সে বেটাছেলে, লেখাপড়া শিখিয়াছে, বড়ঘরে তাহার বিবাহও দিয়াছি—সে যেমন করিয়া হউক, আজ না হয়, দুদিন পরেও মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিবে। কেবল লীলার জন্য—লীলার স্বামী মাতাল—বদ্‌রাগী লোক—আমার সোণার লীলার যে দশা করিয়াছে—দেখিলে চোখে জল আসে। লীলার জন্য আমার মরণেও সুখ হইবে না। লীলা এখন এখানে আছে, অনেক করিয়া তবে তাহাকে এবার আনিয়াছি।"

আমি বলিলাম, "হাঁ, এইবার আমি তাহাকে দেখিয়াছি—আমি প্রথমে লীলাকে চিনিতে পারি নাই।"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া জননী বলিলেন, "লীলা এখন সেই রকমই হইয়াছে।" তাঁহার চক্ষে দুইবিন্দু অশ্রু সঞ্চিত হইল। তাহার পর বলিলেন, "লীলার একটী ছেলে হইয়াছে—দেখ নাই ?"

আমি শুষ্ক হাস্যের সহিত বলিলাম, "না।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পাশের ঘরে লীলা ছিল, লীলার মা তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "লীলা, প্রবোধচাঁদকে একবার এ ঘরে নিয়ে আয়—তোর যোগেশদাদা এসেছে—দেখ্‌বে।"

বলা বাহুল্য, শিশুর ক্রন্দনে এবং লীলার ব্যস্ততায় তাহা আমি পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম। অনতিবিলম্বে শিশুপুত্র ক্রোড়ে লীলা আমাদিগের ঘরে প্রবেশ করিল—দেখিলাম, সেই সেদিনের খেলাঘরের বালুকাকে অন্নে, কচুপাতাকে ঘণ্টে, ইঁটের ক্ষুদ্র টুকরাগুলিকে মৎস্যে এবং পরমান্নে পরিণত করিবার অসীমক্ষমতাধারিণী পাচিকা, হাস্যচপলা ছোট লীলা আজ মাতৃপদাধিষ্ঠাত্রী।

লীলা গৃহতলে বসিল। শৈশবে দুইজনে একসঙ্গে খেলা করিয়াছি, ছুটাছুটি করিয়াছি, ঝগড়া করিয়াছি, আবার ভাব করিয়াছি; ভাবের পর একসঙ্গে বসিয়া কত গল্প করিয়াছি। বুঝিতে পারিলাম না, কেমন করিয়া কোন্ দিন সহসা সে শৈশবস্বর্গচ্যুত হইলাম। শুধু স্মৃতিমাত্র রহিয়া গেল। যাহা হউক, যদিও এখন সে লীলা নাই, তথাপি লীলা আমাদের পাড়ার মেয়ে, তাহাকে আমি এতটুকু হইতে দেখিয়া আসিতেছি, আমাকে দেখিয়া তাহার লজ্জা করিবার কোন আবশ্যকতা ছিল না। সে মাথায় একটু কাপড় দিয়া বসিল। আমি সস্নেহে তাহার শিশুপুত্রকে বুকে করিলাম।

দিব্য সুন্দর টুকটুকে ছেলেটি—মুখ, চোখ ও কপালের গড়ন ঠিক লীলারই মত। বুঝিলাম, লীলাকে প্রবোধ দিতেই এই প্রবোধচাঁদের জন্ম, এবং লীলা হইতে তাহার এইরূপ নামকরণ।

তাহার পর লীলার মাতা লীলার অদৃষ্টকে শতবার ধিক্কার দিয়া এবং লীলার স্বামীর প্রতি অনেক দুর্ব্বচন প্রয়োগ করিয়া নিন্দাবাদ করিতে

লাগিলেন। তাহাতে লীলার মলিন মুখ আরও অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। স্বামীনিন্দা হিন্দুরমণীমাত্রেরই নিকটে অপ্রীতিকর। তা লীলা শিক্ষিতা এবং সৎকুলোদ্ভবা। লীলার স্বামীভক্তি অচলা হউক, লীলার চরিত্রহীন স্বামী দেবতুল্য হউক, লীলা সুখী হউক, আমি তাহাতেই সুখী।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

লীলার মা সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন না। তাঁহার পবিত্র আত্মা পরলোকগত স্বামীর উদ্দেশে চলিয়া গেল। দুই মাস পরে পিতৃমাতৃহীনা লীলা স্বামিগৃহে উপস্থিত হইল এবং পূর্ব্বের ন্যায় এবারেও দুর্ভাগিনী, কাণ্ডজ্ঞানহীন মদ্যপ স্বামীর নিকটে উৎপীড়িতা হইতে লাগিল।

ক্রমে আমি ধৈর্য্য হারাইলাম। যেমন করিয়া পারি, লীলার কষ্ট দূর করিতে হইবে। কি উপায় করি ? অনেক চিন্তার পর স্থির করিলাম, পূর্ব্বে শশিভূষণের সহিত আমার খুব বন্ধুত্ব ছিল—আবার তাহার সহিত সেই বন্ধুত্ব গাঢ় করিয়া তুলিতে হইবে। যদি তাহার সহিত মিলিয়া মিশিয়া ক্রমে তাহার সেই হেয়তম ঘৃণ্য চরিত্রের কিছুমাত্র সংশোধন করিতে পারি।

কার্য্যে তাহাই ঘটিল। আমি মধ্যে মধ্যে—তাহার পর প্রত্যহ শশিভূষণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আরম্ভ করিলাম। উভয়ের মধ্যে আবার ঘনিষ্ঠতা নামক পদার্থটি অত্যন্ত নিবিড় হইয়া আসিতে লাগিল। এখন তাহাদের বাড়ীতে গেলে শশিভূষণ আমাকে যথেষ্ট খাতির যত্ন করিত।

দুই-চারি দিনের মধ্যে কথায় কথায় বুঝিতে পারিলাম, শশিভূষণ লীলাকে অত্যন্ত ভালবাসে। শুনিয়া সুখী হইলাম বটে, কিন্তু অত্যন্ত ভালবাসার উপরে এ অত্যন্ত অত্যাচারের কারণ কিছুতেই নির্দ্ধারণ করিতে পারিলাম না।

যাহাই হউক, তাহার সেই মনোভাবে আমার মনে অনেকটা আশার সঞ্চার হইল। মনে করিলাম, আমার প্রচুর উপদেশ-বৃষ্টিবর্ষণে তাহার প্রেমতৃষ্ণার্ত্ত মরুহৃদয়ে এক সময়ে না এক সময়ে সৎপ্রবৃত্তির বীজ উপ্ত হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। আমি বহু শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করিয়া এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর ফুটনোট করিয়া তাহাকে বুঝাইতাম যে, ধর্ম্মপত্নীর উপর দুর্ব্যবহার করা শাস্ত্রবিগর্হিত কাজ; এবং তজ্জন্য অধঃপতন অনিবার্য্য। নরেন্দ্রের সহিত একান্ত হৃদ্যতায় আমার যে এই অযাচিতভাবে উপদেশ প্রয়োগে কিছু অধিকার আছে, তাহা শশিভূষণ বুঝিত; এবং ভবিষ্যতে যাহাতে আমার উপদেশ রক্ষা করিয়া কাজ করিতে পারে, সেজন্য যথেষ্ট আন্তরিকতা প্রকাশ করিত।

এইরূপে তাহাকে অনেকটা প্রকৃতিস্থ করিলাম। কিছুদিন সে আমার কথা রক্ষা করিয়াছিল; পরে আবার যে-কে-সেই। যেদিন বেশি মদ খাইত, সেদিন লীলার প্রতি দুর্বৃত্তের অত্যাচার একেবারে সীমাতিক্রম করিয়া উঠিত। তখন আমি উপদেশের পরিবর্ত্তে রুষ্ট-হৃদয়ে তাহাকে যথোচিত তিরস্কার করিতাম। কখন সে মৌন থাকিত এবং কখনও বা অসন্তোষ প্রকাশ করিত।

একদিন শশিভূষণ মদের মুখে—অসদ্ভাবে নয়, সরল প্রাণে কলুষিত কাহিনী-পূর্ণ এইরূপ আত্ম-পরিচয় আমাকে দিতে লাগিল, "ভাই যোগেশ, আমার মতি গতি যাহাতে ভিন্নপথে চালিত হয়, সেজন্য তুমি যে যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছ, তাহা যে আমি বুঝিতে পারি নাই, তাহা নহে। যদিও আমি মাতাল, কাণ্ডজ্ঞানহীন, তথাপি আমি তোমার মনের ভাব বেশ বুঝিতে পারি। তুমি আমাকে অনেক বুঝাইয়াছ, বুঝি নাই, ভর্ৎসনা করিয়াছ—আমারই ভালর জন্য। সব বুঝিতে পারি, বুঝিলে হবে কি, বেশী মদ খাইলে আর আমার কিছুই মনে থাকে না। বাঁচিয়া থাকিতে যে মদ ছাড়িতে পারিব—কখনই না। যদিও পারিতাম, এখন আর তাহা পারিব

না। আমার মনের ভিতরে কি বিষের হল্কা বহিতেছে, কে জানিবে ? মদ খাইয়া অনেকটা ভাল থাকি। ইহার ভিতরে অনেক কথা আছে। কথাটা শুনিয়া যাও, এ পৃথিবীতে আমার মত তোমার ঘোরতর শত্রু আর কেহ নাই। আমি জানি, তুমি লীলাকে ভালবাসিতে এবং লীলার সহিত তোমার বিবাহ হইবে ; কিন্তু—"

শুনিয়া আমি আপাদমস্তক শিহরিয়া উঠিলাম। শশিভূষণ সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া বলিতে লাগিল, "লীলা যে তোমাকে ভালবাসে, আমি সে কথা অনুভব করিতে একবারও চেষ্টা করি নাই। যেদিন আমি সৌন্দর্য্য-মণ্ডিতা লীলাকে দেখিলাম, সেইদিন হইতে তাহার জন্য একটা অদম্য আকাঙ্ক্ষায় আমার সমগ্র হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। স্নেহ, মমতা, প্রেম প্রভৃতির অস্তিত্ব যে আমার হৃদয়ে আছে, সে সম্বন্ধে আমার নিজেরই কিছুমাত্র বিশ্বাস ছিল না, কিন্তু যেদিন দেবী-প্রতিমার ন্যায় অশেষমহিমময়ী লীলাকে দেখিলাম, শত সৎপ্রবৃত্তি যেন হৃদয়দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া, সেই দেবী-প্রতিমার অর্চ্চনার জন্য সহস্র ব্যগ্র-বাহু প্রসারণ করিয়া একেবারে আকুল হইয়া উঠিল। সন্ধান লইয়া জানিলাম, তোমার সহিত লীলার বিবাহ হইবে। সেজন্য লীলার মা আর নরেন্দ্রনাথের যথেষ্ট আগ্রহ আছে। আর তোমার আর্থিক অবস্থা যেমনই হউক, তোমার সচ্চরিত্রতার উপর তাঁহাদের একান্ত বিশ্বাস। স্থির করিলাম, নিজের অভিষ্ট সিদ্ধির জন্য তাঁহাদের সে অনন্ত বিশ্বাস ক্রুত ভাঙিতে হইবে।"

আমি স্তম্ভিত হৃদয়ে সংযতশ্বাসে তাহার হৃদয়হীনতা ও পাষণ্ডপণার ঘৃণ্য কাহিনী শুনিতে লাগিলাম।

"তাহার পর তোমার রুগ্না মাতাকে লইয়া তুমি বৈদ্যনাথ চলিয়া গেলে। আমি সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। তুমি যেদিন যাও, তাহার দুইদিন পূর্ব্বে বোধ হয় শুনিয়া গিয়াছিলে, হরিহর মুখোপাধ্যায়ের বিধবা কন্যাটি সহসা অন্তর্হিত হইয়াছে ; সে কাজ আমারই। আমিই সেই

ব্রাহ্মণকন্যা মোক্ষদাকে গ্রামের বাহিরে—কেহ না সন্ধান করিতে পারে—এমন একটি গুপ্ত স্থানে রাখিয়াছিলাম। সমাজের চক্ষে মোক্ষদা যতই কেন দোষী হউক না, সে তাহার দোষ নহে, তাহাদিগের কৌলীন্য-প্রথার দোষ। তোমরা বৈদ্যনাথ যাইবার ছয় মাস পূর্ব্বে মোক্ষদার সহিত আমার পরিচয় হয়। মোক্ষদা আমাকে খুব ভালবাসিত—এখনও তাহার সেই ভাব। হায়, যদি তাহারই সেই নিঃস্বার্থ ভালবাসায় চিরমুগ্ধ থাকিতাম—যদি রূপৈশ্বর্য্যময়ী লীলা আমার চোখে না পড়িত; এবং সেই একবার দর্শনে আমার সমগ্র হৃদয় মোহময় করিয়া না তুলিত, তাহা হইলে বোধ হয়, পাপেই হউক, আর পুণ্যেই হউক, মোক্ষদাকে লইয়াই এ জীবনে এক রকম সুখী হইতে পারিতাম। সে কথা যাক্, তাহার পর আমি গ্রামের মধ্যে রটনা করিয়া দিলাম, মোক্ষদার অপহরণটি তোমার দ্বারাই হইয়াছে—”

কি নৃশংস!

“তুমি মোক্ষদাকে আগে বৈদ্যনাথে পাঠাইয়া দিয়াছ, সেখানে তাহাকে কোন স্বতন্ত্র বাটীতে রাখিয়া, অপর একখানি বাটী ভাড়া করিয়া মাতাপুত্রে থাকিবে, এইরূপ অভিপ্রায়ে তুমি মাতার পীড়া উপলক্ষ্য করিয়া বৈদ্যনাথ গিয়াছ। তার পর কতকগুলা মিথ্যা প্রমাণ ঠিক করিয়া এখানকার সকলেরই নিকটে কথাটি খুব বিশ্বাস্য করিয়া তুলিলাম। নরেন্দ্র আর লীলার মা তোমাকে ভাল রকমে জানিতেন—তাঁহারা কথাটা প্রথমে অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত শুনিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বিশ্বাস করেন নাই। তাহাতে আমার অভিষ্ট সিদ্ধির কোন ব্যাঘাত ঘটিল না। কেন না, লীলার পিতা ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই দেখিলেন না, এবং সহজেই বিশ্বাস করিলেন। তাহার পর দহ্যমান হস্তে একটি ক্ষুদ্র যূথিকাকে বৃন্তচ্যুত করিলাম। সেইদিন স্বহস্তে একটা অক্ষয় চিতা রচনা করিয়া নিজের—শুধু নিজের নহে—লীলার আর তোমার—এক সঙ্গে তিন জনের হৃদ্‌পিণ্ড ছিন্ন করিয়া সেই চিতানলে নিক্ষেপ করিলাম।”

শুনিয়া অনিবার্য্য ক্রোধে আমার শ্বাসরুদ্ধ হইল। মনে করিলাম, তখনই পদতলে দলিত করিয়া তাহার পাপ প্রাণটা এ পৃথিবী হইতে বাহির করিয়া দিই ; কিন্তু তখনই লীলাকে মনে পড়িল—সেই লীলা। এই দানব সেই দেবীরই স্বামী। আর সেই প্রবোধচাঁদ—তাহাকে কোন্ অপরাধে পিতৃহীন করিব ?

ঈশ্বর যেন কখন আমার এমন মতি না দেন। শশিভূষণকে হত্যা করিয়া কোন লাভ নাই ; কিন্তু সেইদিন হইতে প্রতিজ্ঞা করিলাম, সদুপায়ে হউক বা অসদুপায়ে হউক, যেমন করিয়া হউক, এই পাষণ্ডের পীড়ন হইতে লীলাকে মুক্ত রাখিবার জন্য প্রাণপণ করিব ; এবং সেজন্য হিতাহিতবিবেচনাশূন্য হইব।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সপ্তাহ শেষে একদিন সন্ধ্যার কিছু পরে আমি শশিভূষণের সহিত দেখা করিলাম। তখন সে একাকী তাহার একতল বৈঠকখানার উন্মুক্ত ছাদে বসিয়া মদ খাইতেছিল। এবং এক একবার এক একটা বিকট রাগিণী ভাঁজিয়া সেই নির্জ্জন ছাদ এবং নীরব আকাশ প্রতিধ্বনিত করিতেছিল। কি জানি, কেন, সেদিন শশিভূষণ আমার সহিত ভাল করিয়া কথা কহিল না। তাহার সেই অপ্রসন্ন ভাব দেখিয়া বুঝিলাম, তাহার মনের অবস্থা আজ বড় ভাল নহে।

ক্রমে রাত দশটা বাজিয়া গেল। তখন আমি উঠিলাম। আমাকে উঠিতে দেখিয়া শশিভূষণ বলিল, "চল, আমিও নীচে যাইব।" বলিয়া উঠিল।

বাড়ীর সম্মুখে একখানি ছোট সুন্দর বাগান। চারিদিকে ফলের গাছ, সম্মুখে নানাবিধ ফুলের গাছ এবং রঞ্জিতপল্লব ক্রোটনশ্রেণীতে বাগানখানি বেশ এক রকম সুন্দর সাজান। ছাদের সোপান হইতে নামিয়াই আমরা সেই বাগানে আসিয়া পড়িলাম।

তখন শশিভূষণ আমাকে বলিল, "যোগেশ, তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।"

আমি বিস্মিত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলাম।

শশিভূষণ বলিল, "কাল হইতে তুমি আর এখানে আসিয়ো না, তুমি যে মতলবে যাওয়া-আসা করিতেছ, আমি মাতাল বলে তাহা কি বুঝিতে পারি না? আমি তেমন মাতাল নই। সহজ লোক নও তুমি—চোরের উপরে বাটপাড়ী করিতে চাও?"

কথাগুলা বজ্রাঘাতের ন্যায় আমার বুকে আঘাত করিল। সেদিন তাহারই মুখে তাহার নীচাশয়তার কথা শুনিয়া আমি ক্রোধে আত্মহারা হইয়াছিলাম। কেবল লীলার জন্য আমি দ্বিরুক্তি করি নাই—করিতে পারি নাই। আজ সহসা শশিভূষণের এই কটূক্তি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় সবেগে আমার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল। আজ ক্রোধ সম্বরণ করা আমার পক্ষে একান্ত অসাধ্য হইয়া উঠিল। আমি বলিলাম, "শশিভূষণ, তুমি পশু অপেক্ষা অধম, তোমার মন যেমন কলুষিত, তাহাতে তুমি এইরূপ না বুঝিয়া ইহার অধিক আর কি বুঝিবে? আমার মনের ভাব বুঝিতে তোমার মত নারকীর অনেক বিলম্ব আছে; কেবল লীলার মুখ চাহিয়াই আমি তোমার অমার্জ্জনীয় অপরাধ সকল উপেক্ষা করিয়াছি।

শশিভূষণ বিকৃত কণ্ঠে কহিল, "লীলা, লীলা তোমার কে? তুমিই বা লীলার কে—তাহার কথা লইয়া তোমারই বা এত আন্তরিকতা প্রকাশ কেন? আমি আমার স্ত্রীকে যাহা খুসী তাহাই করিব, তাহাতে তোমার এত মাথাব্যথা কেন হে? আমি কি কিছু বুঝি না বটে? যাও যাও, তোমার মত ভণ্ড তপস্বী আমি অনেক দেখিয়াছি। মারের চোটে গন্ধর্ব্ব ছুটিয়া যায়, তাহাতে আর আমি তোমার চিন্তাটা লীলার মাথার ভিতর হইতে বাহির করিয়া ফেলিতে পারিব না?"

আমি অনিবার্য্য ক্রোধে আত্মসম্ভ্রমবোধশূন্য হইলাম। কহিলাম, "শো

শশিভূষণ, আমি জীবিত থাকিতে তুমি লীলার একটি মাত্র কেশের অপচয় করিতে পারিবে না। ইহার পর লীলার প্রতি যদি কখনও তোমার কোন অত্যাচারের কথা শুনি, সেই দণ্ডে আমি তোমাকে খুন করিব। তাহাতে আমাকে যদি ফাঁসির দড়িতে ঝুলিতে হয়, তাহাও শ্রেয়ঃ—আমি আর কখনই তোমাকে ক্ষমা করিব না।"

শশিভূষণ অত্যন্ত রোষাবিষ্ট হইয়া, মস্তকান্দোলন করিয়া কহিল, "বেশ বেশ, কে কাকে খুন করে দেখা যাবে। আমি আগে লীলাকে খুন কর্‌ব—তার পর তোকে খুন কর্‌ব—কি স্পর্দ্ধা, লীলার একটা কেশের অপচয় কর্‌লে আমাকে খুন কর্‌বে! আমি যদি আজ লীলার রক্ত-দর্শন না করি, তা হ'লে আমার নাম শশিভূষণই নয়; দেখি, তুই আমার কি করিস্।"

দুর্ব্বৃত্ত তখন অত্যন্ত মাতাল হইয়াছিল; তাহার সহিত আর কোন কথা কহা যুক্তি-সঙ্গত নহে মনে করিয়া, আমি তাহার বাগান হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। সে চলিয়া গেল, কি দাঁড়াইয়া রহিল, একবার ফিরিয়া দেখিলাম না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

রাস্তায় আসিয়া মনটা বড়ই খারাপ হইয়া গেল। নিজেকে বারংবার ধিক্কার দিতে লাগিলাম। কেন আমি শশিভূষণকে এমন রাগাইয়া দিলাম? এই রাগের মুখে হয় ত আজ মদোন্মত্ত পিশাচ অভাগিনী লীলাকে কতই না যন্ত্রণা দিবে? এত দিন এত সহিয়াছি—আজ কেন আমি এমন করিলাম? কি কুক্ষণে কোন্ দুর্ম্মুখের মুখ দেখিয়া আজ আমি শশিভূষণের সঙ্গে দেখা করিতে বাটীর বাহির হইয়াছিলাম! কেন আমি এমন সর্ব্বনাশ করিলাম! হায় হায়! আমি লীলার ভাল করিতে গিয়া অগ্রেই তাহার মন্দ করিয়া ফেলিলাম। মনুষ্য যা মনে করে—নির্দ্দয় বিধাতা তাহার এমনই বিপরীত ঘটাইয়া দেয়।

আমার মানসিক প্রবৃত্তিসমূহে তখন কেমন একটা গোলমাল পড়িয়া গেল। কি ভাবিতেছি—কি ভাবিতে হইবে—কি হইল, এই সব তোলাপাড়া করিতে করিতে যেন আমি কতকটা আত্মহারা হইয়া গেলাম। অশেষ-সদ্‌গুণাভরণা, সৌম্যশ্রী লীলার সুখ দুঃখ যে এখন এমন একটা দয়াশূন্য, ক্ষমাশূন্য, নিষ্ঠুরতম বর্ব্বরের হাতে নির্ভর করিতেছে, এ চিন্তা প্রতিক্ষণে আমার হৃদয়ে সহস্র বৃশ্চিক-দংশনের জ্বালা অনুভব করাইতে লাগিল। তেমনি প্রতিক্ষণে একটা শ্বাপদসুলভ প্রতিহিংসাতৃষ্ণা হৃদয়ের মধ্যে একান্ত অদম্য হইয়া উঠিতে লাগিল। এবং তেমনি প্রতিক্ষণে মন্ত্রৌষধিরুদ্ধবীর্য্য সর্পীর ন্যায় সেই প্রতিহিংসা নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িতে লাগিল। কি করিব? কোন উপায় নাই। নিজের বুকে বিষাক্ত দীর্ঘ ছুরিকা শতবার আমূল বিদ্ধ করিতে পারি; কিন্তু মূঢ় শশিভূষণের গায়ে একবার একটা আঁচড় দিই, এমন ক্ষমতা আমার নাই। নির্জ্জনে পথিমধ্যে প্রতিমুহূর্ত্তে আমার বেশ স্পষ্ট অনুভূত হইতে লাগিল যে, নির্ব্বিঘ্নে চিন্তারাক্ষসী আমার হৃদ্‌পিণ্ড শোষণ করিয়া রক্তশোষণ করিতেছে। আমি মুমূর্ষুর ন্যায় গৃহে ফিরিলাম। তাহার পর—হে সর্ব্বজ্ঞ! সর্ব্বশক্তিমান্! তুমি জান প্রভো! তাহার পর যাহা ঘটিয়াছিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

হায়, পরদিন প্রভাতের সেই লোমহর্ষণ ঘটনার সেই ভয়ঙ্করী স্মৃতির হাত হইতে আমি কি মরিয়াও অব্যাহতি পাইব?

তখন বেলা ঠিক দশটা। এমন সময়ে নরেন্দ্রনাথ ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া আমার ঘরে প্রবেশ করিল। দেখিলাম তাহার মুখ বিবর্ণ, এবং দৃষ্টি উন্মাদের। মুখ চোখের ভাবে যেন একটা কোন ভীষণতার ছায়া লাগিয়া রহিয়াছে। দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলাম।

নরেন্দ্রনাথ দৃঢ়মুষ্টিতে আমার জামাটা ধরিয়া এমন একটা টান দিল, আর একটু হইলে বা জামাটা অধিক দিনের পুরাতন হইলে তাহাতেই সেটা একেবারেই ছিঁড়িয়া যাইত। নরেন্দ্রনাথ ব্যাকুলকণ্ঠে কেবল বলিতে লাগিল, "যোগেশদা, সর্ব্বনাশ হয়েছে! যা ভেবেছিলাম, তাই হয়েছে—একেবারে খুন, আর উপায় নাই। যোগেশদা, কি হবে—তুমি চল—শীঘ্র ওঠো—এমন খুনে সে—"

আমি বিস্ময়বিহ্বলচিত্তে দাঁড়াইয়া উঠিলাম। সেই মুহূর্ত্তে একটা অনিবার্য্য বিমূঢ়তা আসিয়া আমার মস্তিষ্ক এমন পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া বসিল যে, আমি নরেন্দ্রের কথা কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। আমি তাহাকে একান্ত উৎকণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হয়েছে নরেন, আমি তোমার কথা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

দেখিলাম, নরেন্দ্রনাথের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ। সে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "সর্ব্বনাশ হয়েছে যোগেশদাদা! লীলা নাই—শশিভূষণ কাল রাত্রে লীলাকে খুন করিয়াছে। পুলিশের লোক শশিভূষণকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।"

আর শুনিতে পাইলাম না, বজ্রাহতের ন্যায় সেইখানে নিঃসংজ্ঞ অবস্থায় পড়িয়া গেলাম।

যখন কিছু প্রকৃতিস্থ হইলাম, দেখি, নরেন্দ্রনাথ পাশে বাসয়া আমার চোখে মুখে জলের ছিটা দিতেছে।

আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া তাহাকে বলিলাম, "আর কিছু করিতে হইবে না। সহসা এ ভয়ানক কথাটা শুনিয়াই—যাক্, তুমি বলিতেছিলে না শশিভূষণকে পুলিসের লোকে গ্রেপ্তার করিয়াছে ?

নরেন্দ্রনাথ কহিল, "তাহাকে অনেকক্ষণ চালান দিয়াছে, চালান দিতে শশিভূষণের উপরে বড় একটা জোর-জবরদস্তি করিতে হয় নাই ; সে একটা আপত্তিও করে নাই—নিজেই ধরা দিয়াছে। হয় ত শশিভূষণের তখনও

নেশার ঝোঁক ছিল। যাই হোক, তুমি একবার চল যোগেশদা, এমন সময়ে তোমার একবার যাওয়া খুবই দরকার, যদি কোন একটা উপায় হয়।”

আমি কম্পিত-কণ্ঠে, কম্পিত-হৃদয়ে এবং কম্পিত-কলেবরে ভীতি-বিহ্বলের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিলাম, “কোথায়? লীলাকে দেখিতে? দাঁড়াও—দাঁড়াও—নরেন্দ্র, আমায় একটু প্রকৃতিস্থ হইতে দাও—আমি বুঝিতে পারিতেছি না, আমার বুকের ভিতরে যেন কি হইতেছে!”

আমার ভাবভঙ্গী দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ আমার মনের অবস্থা সম্যক্ বুঝিতে পারিয়াছিল। আমার কথায় সম্মত হইল; কিন্তু সে একান্ত অধীরভাবে আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে দেখিয়া আমি আর বড় বিলম্ব করিলাম না—তখনই বাহির হইলাম।

নবম পরিচ্ছেদ

যথাসময়ে আমরা শশিভূষণের বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিলাম, এ কাহিনীর মধ্যে একান্ত উল্লেখযোগ্য হইলেও, তাহা আমি বলিতে ইচ্ছা করি না। সেজন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন।

এই হত্যা সম্বন্ধে শশিভূষণের বিরুদ্ধে যে সকল প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে সেই যে দোষী, সে সম্বন্ধে আর কাহারও কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। গত রাত্রে উদ্যানমধ্যে আমার সহিত শশিভূষণের যে সকল কথা হইয়াছিল, একজন দাসী তাহা শুনিয়াছে, সে নিজের জোবানবন্দীতে আমাদের মুখনিঃসৃত প্রত্যেক কথাটিরই পুনরাবৃত্তি করিয়াছে। প্রাতঃকালে লীলার মৃতদেহ বিছানার পাশে পড়িয়া ছিল এবং তাহার বক্ষে একখানি ছুরিকা আমূল প্রোথিত ছিল; সে ছুরিখানি শশিভূষণের নিজেরই ছুরি। অনেকেই সেই ছুরিখানি তাহার বৈঠকখানা ঘরে অনেকবার দেখিয়াছে। সে রকম ধরণের প্রকাণ্ড

ছুরি সে গ্রামের মধ্যে আর কাহারও ছিল না। শশিভূষণের বিরুদ্ধে আরও একটা বিশেষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, গতরাত্রে শয়নকালে তাহাদিগের স্ত্রীপুরুষের মধ্যে একটা অত্যধিক বাগ্বিতণ্ডা হইয়াছিল। এবং শশিভূষণ তাহাকে অত্যধিক প্রহার করিয়াছিল। লীলার কপালে একটা মুষ্ট্যাঘাতের চিহ্নও ছিল। ডাক্তারী পরীক্ষায় এইরূপ স্থিরীকৃত হয় যে, মৃত্যুর দুই-এক ঘণ্টা পূর্ব্বে তাহাকে সে আঘাত করা হইয়াছিল।

এ সকল প্রতিপাদ্য প্রমাণ সত্ত্বেও সে যে স্ত্রীহন্তা, তাহা শশিভূষণ এখনও স্বীকার করিতে সম্মত নহে। সে অবিচলিতভাবে এখনও বলিতেছে, সে সম্পূর্ণ নিরপরাধ। তাহাকে ফাঁসিই দাও—মার—কাট—খুন কর—যা ইচ্ছা তাই কর—সেজন্য সে কিছুমাত্র দুঃখিত নহে। শশিভূষণ সর্ব্বসমক্ষে এখনও স্বীকার করিতেছে যে, সে তাহার পত্নীর প্রতি অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করিত, মদের খেয়ালই তাহার একমাত্র কারণ; নতুবা সে তাহার স্ত্রীকে যথেষ্ট ভালবাসিত; এক্ষণে লীলাকে হারাইয়া তাহার জীবন একান্ত দুর্ব্বহ হইয়া উঠিয়াছে। জীবন ধারণে তাহার তিলমাত্র ইচ্ছা নাই। শশিভূষণের এ সকল কথা কতদূর সত্য, তাহা বিবেচনা করিবার শক্তি আমার তখন ছিল না। আরও শুনিলাম, আমার সহিত একবার দেখা করিবার তাহার বড়ই আগ্রহ। যে কেহ তাহার সহিত দেখা করিতে যাইত, তাহাকেই সে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিত, আমি যেন একবার যাইয়া তাহার সহিত দেখা করি।

শশিভূষণের সহিত দেখা করিবার আমার ততটা ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু তাহার এইরূপ বারংবার আগ্রহ প্রকাশে অনিচ্ছাসত্ত্বেও একদিন আমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম।

নিজের হাজত ঘরে আমাকে উপস্থিত দেখিয়া শশিভূষণ অত্যন্ত আহ্লাদিত হইল; এবং আমার উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়াছে বলিয়া—আরও আমার সহিত যে সমুদায় অন্যায় ব্যবহার করিয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া, বারংবার আমার নিকটে অশ্রুসংরুদ্ধকণ্ঠে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। তাহার পর বলিল, "ভাই যোগেশ, তুমি আমাকে ক্ষমা করিলে; কিন্তু অভাগিনী লীলা কি এমন নরকের কীটকে কখন ক্ষমা করিবে? আমি আজ আমার পাপের ফল পাইলাম। ধর্ম্মের বিচার অব্যাহত—আজ না হউক, দুদিন পরে নিশ্চয়ই সকলকে স্বকৃত পাপপুণ্যের ফলভোগ করিতে হইবে; কেহই তাহার হাত এড়াইতে পারে না। আমি লীলার প্রতি যে সকল নিষ্ঠুরাচরণ করিয়াছি, বোধ করি কোন কঠোর রাক্ষসেও তাহা পারে না। আমি মনুষ্য নামের একান্ত অযোগ্য—আমার ন্যায় মহাপাপীর নাম এ জগৎ হইতে চিরকালের জন্য মুছিয়া যাওয়াই ভাল। ভাই যোগেশ, আজ সকলেই বিশ্বাস করিয়াছে, আমি লীলার হত্যাকারী। তুমিও যে এমন বিশ্বাস কর নাই, তাহাও নহে। জগতের সকলেরই মনে আমার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ এই ধারণা, এই বিশ্বাস চিরন্তন অটুট এবং অটল থাকিয়া যাক্—বরং তাহাতে আমি সুখী; কিন্তু তুমি—যোগেশ, তুমি যেন আর সকলের মত তাহা মনে করিয়ো না, এই কথা বলিবার জন্যই আমি তোমার সহিত দেখা করিতে এত উৎসুক হইয়াছিলাম। আমার সত্য নাই, ধর্ম্ম নাই, এমন কিছুই নাই, যাহা সাক্ষী করিয়া স্বীকার করিলে তুমি কিছুমাত্র বিশ্বাস করিতে পার। আমি ধর্ম্মবিচ্যুত, মনুষ্যত্ব-বিবর্জ্জিত, শয়তানের মোহমন্ত্রপ্রণোদিত, জগতের অকল্যাণের পূর্ণ প্রতিমূর্ত্তি—আমার কথায় কে বিশ্বাস করিবে? ভাই যোগেশ, তুমি ভাই অবিশ্বাস করিয়ো না, তাহা হইলে মরিয়াও আমার সুখ হইবে না—এ

জগতে এমন একজন থাক্, সে যেন জানে, আমি একটা মহাপাপী ছিলাম বটে, কিন্তু স্ত্রীহন্তা নই।"

বলিতে বলিতে শশিভূষণের কণ্ঠ কম্পিত এবং বাষ্পরুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। সে দুই হাতে মুখ চাপিয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিল।

বলিতে কি, তাহার সেই সকরুণ অবস্থা তখন আমার মর্ম্মভেদ ও সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছিল। অনেক করিয়া তাহার পর আমি তাহাকে শান্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "শশিভূষণ, এ পর্য্যন্ত যাহা ঘটিয়াছে, তুমি অকপটে সব আমাকে বল ; কোন কথা গোপন করিতে চেষ্টামাত্রও করিয়ো না—যদি এ দুঃসময়ে আমি তোমার কোন উপকারে আসিতে পারি।"

শশিভূষণ বলিল, "আমি প্রভাতে উঠিয়া প্রথমে দেখিলাম, লীলা রক্তাক্ত হইয়া আমার বিছানার পাশে পড়িয়া রহিয়াছে। ধরিয়া তুলিতে গেলাম—দেখিলাম, দেহে প্রাণ নাই। দেখিয়াই আমার বুকের রক্ত স্তম্ভিত হইয়া গেল। বুঝিলাম, লীলা এ পিশাচকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড খুঁজিলে আর তাহাকে ফিরিয়া পাইব না—পাইবার নহে। বলিতে কি, যোগেশ! প্রথমে আমার বোধ হইল, মদের ঝোঁকে আমিই তাকে রাত্রে হত্যা করিয়াছি। তাহার পর যখন দেখিলাম, আমারই ছুরিখানা লীলার বুকে তখনও আমূল বিদ্ধ রহিয়াছে, তখন আমার সে ভ্রম দূর হইল। আমার এখন বেশ মনে পড়িতেছে, ছুরিখানি আমার বৈঠকখানায় যেখানে থাকিত, সেখানে ছুরিখনি কাল রাত্রে দেখিতে পাই নাই, পরে খুঁজিয়াও কোথাও পাওয়া গেল না। আমি সে কথা তখনই লীলাকেও বলিয়াছিলাম। সেজন্যই মনে একটু সন্দেহ হইতেছে ; নতুবা এখনও আমার মনে বিশ্বাস, কাণ্ডজ্ঞানহীন আমিই লীলার হত্যাকারী ; কিন্তু সেই ছুরিখানি যোগেশ, আরও ইহার ভিতরে

আর একটা কথা আছে, আমার বোধ হয়—ঠিক বলিতে পারি না—যদি—যদি—"

শশিভূষণকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া নিজেও যেন একটু ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলাম। সে ভাব তখনই সাম্‌লাইয়া আমি তাহাকে বলিলাম, "কথা কহিতে এমন সঙ্কুচিত হইতেছ কেন ? তুমি যা জান বা বোধ কর, আমাকে স্পষ্ট বল।"

শশিভূষণ বলিল, "লীলার বুকে ছুরি বসাইতে পারে, একজন ছাড়া তাহার এমন ভয়ানক শত্রু আর কেহ নাই। তাহারই উপরে আমার কিছু সন্দেহ হয়—"

আমি অত্যধিক ব্যগ্রতার সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে সে ?—তাহার নাম প্রকাশ কর নাই কেন ?"

শশিভূষণ অনুচ্চ স্বরে বলিল, "তুমি তাহাকে জান, আমি মোক্ষদার কথা বলিতেছি। যেদিন আমার বিবাহ হইয়াছে, সেইদিন হইতে মোক্ষদাও ভিন্ন মূর্ত্তি ধরিয়াছে। কি একটা হতাশায় সে যেন একেবারে মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। অনেকবার সে আমাকে শাসিত করিয়া বলিয়াছে, 'ইহার ফল তোমাকে ভোগ করিতে হইবে—আমি যে-সে মেয়ে নই—তবে আমার নাম মোক্ষদা। এক বাণে কেমন করিয়া দুটা পাখী মারিতে হয় আমা হইতেই তাহা একদিন তুমি দেখিতে পাইবে।"

শশিভুষণ আবার দুই হাতে দুই চক্ষু আবৃত করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

আমি অতিশয় চকিত হইয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলাম, "অসম্ভব! তাহা কি কখনও হয় ?"

অনুতাপদগ্ধ রোরুদ্যমান শশিভূষণ বলিল, তাহা না হইলেও, আমি তোমাকে বিশেষ অনুনয় করিয়া বলিতেছি, লীলার প্রকৃত হত্যাকারী কে, যাহাতে তুমি সন্ধান করিয়া বাহির করিতে পার, সেজন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিবে।" তাহার পর মুখ হইতে হাত নামাইয়া, তাহার অশ্রুসিক্ত করুণ

দৃষ্টি আমার মুখের উপর স্থাপন করিয়া বলিতে লাগিল, "ভাই যোগেশ, তুমি মনে করিতেছ, আমার নিজের জন্য তোমাকে আমি এমন অনুরোধ করিতেছি—তাহা ঠিক নয়, আমার ফাঁসি হউক বা না হউক, সেজন্য আমি কিছুমাত্র চিন্তিত নহি, একদিন ত সকলকেই মরিতে হইবে—তা দুইদিন আগে আর পরে ; কিন্তু—কিন্তু যোগেশ, যখনই মনে হয় যে, লীলার হত্যাকারী তাহার এ নৃশংসতার কোন প্রতিফল পাইবে না—"

বলিতে বলিতে শশিভূষণের অশ্রুমগ্ন দৃষ্টি সহসা মেঘকৃষ্ণ রাত্রের তীব্র বিদ্যুদগ্নির ন্যায় ঝলসিয়া উঠিল। এবং এমন দৃঢ়রূপে সে নিজের হাত নিজেই মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ধরিল যে, হাতের কব্জীতে নখরগুলা বিদ্ধ হইয়া রক্তপাত হইতে লাগিল।

যদিও আমি শশিভূষণকে অতিশয় ঘৃণার চোখে দেখিতাম, কিন্তু এখন তাহাকে নিদারুণ অনুতপ্ত এবং মর্ম্মাহত দেখিয়া আমার সে ভাব মন হইতে একেবারে তিরোহিত হইয়া গেল। শোকার্ত্ত শশিভূষণের সেই কাতরতায় আর আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না। বলিলাম, "শশিভূষণ, যেমন করিয়া পারি, তোমার নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিব। এখন হইতেই আমি ইহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিব।"

এইরূপ প্রতিশ্রুতির পর আমি তাহার নিকট হইতে সেদিন বিদায় লইলাম।

দ্বিতীয়ার্দ্ধ

প্রথম পরিচ্ছেদ

যোগেশচন্দ্রের কথা

একজন পুরাতন পাকা নামজাদা গোয়েন্দা বলিয়া বৃদ্ধ অক্ষয়কুমারের নামের ডাক যশঃ খুব। আমি এখন তাঁহারই সাহায্য গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত বোধ করিলাম। সেইদিনই বৈকালে আমি অক্ষয়বাবুর বাড়ীতে গেলাম।

বৃদ্ধ তখন বাহিরের ঘরে তাঁহার কিঞ্চিদধিক পঞ্চমবর্ষীয় পৌত্রটিকে জানূপরি বসাইয়া ঘোটকারোহণ শিক্ষা দিতেছিলেন। আমাকে দ্বার-সমীপাগত দেখিয়া অক্ষয়বাবু তখনকার মত সেই শিক্ষা-কার্য্যটা স্থগিত রাখিলেন। এবং আমাকে উপবেশন করিতে বলিয়া, রামা ভৃত্যকে শীঘ্র এক ছিলিম তামাকের জন্য হুকুম করিলেন। বলা বাহুল্য, অতি সত্বর হুকুম তামিল হইল।

তাহার পর বৃদ্ধ ধূমপানে মনোনিবেশ করিয়া, একটির পর একটি করিয়া ধীরে ধীরে আমার সকল পরিচয় গ্রহণ করিতে লাগিলেন। পরে আমি শশিভূষণ সংক্রান্ত সমুদায় ঘটনা তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলাম। এবং স্বীকার করিলাম, শশিভূষণকে নির্দ্দোষ বলিয়া সপ্রমাণ করিতে পারিলে আমি তাঁহাকে একহাজার টাকা পুরস্কার দিব।

অক্ষয়বাবু অত্যন্ত মনোযোগের সহিত আমার কথাগুলি শুনিলেন। শুনিয়া অনেকক্ষণ করতললগ্নশীর্ষ হইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। আমাকে কিছুই বলিলেন না, বা কোন কথা জিজ্ঞাসাও করিলেন না।

তাঁহাকে সেইরূপ অত্যন্ত চিন্তিতের ন্যায় নীরবে থাকিতে দেখিয়া শেষে আমি বলিলাম, "কিছু জিজ্ঞাসা করিবার থাকে বলুন, আমার মনের স্থিরতা

নাই—হয় ত ঘটনাটা একটানা বলিয়া যাইতে কোন কথা বলিতে ভুল করিয়া থাকিব ; সেইজন্য বোধ হয়, আপনি কিছু গোলযোগে পড়িয়াছেন।”

“না, গোলযোগ কিছু ঘটে নাই,” হুঁকা রাখিয়া, ভাল হইয়া বসিয়া অক্ষয়বাবু বলিলেন, “আমি বেশ ভালরূপেই বুঝিতে পারিয়াছি। সেজন্য কথা হইতেছে না ; তবে কি জানেন, কাজটা বড় সহজ নয় ; সহজ না হইলেও যাহাতে সহজ করিয়া আনিতে পারি, সেজন্য চেষ্টা করিব। তার আগে আপনাকে একটি বিষয়ে আমার কাছে স্বীকৃত হইতে হইবে, আর আমার দুইটি প্রশ্নের ঠিক উত্তর করিবেন।”

আমি বলিলাম, “দুইটি কেন—আপনার যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিবার থাকে, জিজ্ঞাসা করুন, আমি এখনই উত্তর দিব। তবে কোন্ বিষয়ে আমাকে স্বীকৃত হইতে হইবে, তাহা পূর্ব্বে না বলিলে, আমি কি করিয়া বুঝিতে পারিব যে, আমার দ্বারা তাহা সম্ভবপর কি না ? আমার দ্বারা যদি সে কাজ হইতে পারে, এমন আপনি বোধ করেন, তাহা হইলে তাহাতে আমার অন্যমত নাই জানিবেন।”

“সে কথা মন্দ নয়,” বলিয়া অক্ষয়বাবু একটু ইতস্ততঃ করিলেন। তাহার পর বলিলেন, “আমি যে বিষয়ে আপনাকে স্বীকৃত হইতে বলিতেছি, তাহা এমন বিশেষ কিছু নহে, আপনি মনে করিলেই তাহা পারেন ; আজ-কালকার যে বাজার পড়িয়াছে, তাহাতে সেটা যে নিতান্ত আবশ্যক, তাহা নহে। আপনি যে হাজার টাকা পুরস্কার স্বরূপ দিতে চাহিতেছেন, সেইটে এমন একটা লেখাপড়া করিয়া যে কোন একজন ভদ্রলোকের নিকটে আপনাকে গচ্ছিত রাখিতে হইবে যে, পরে যদি আমি কৃতকার্য্য হইতে পারি, সে টাকা আমিই তাঁহার নিকট হইতে গ্রহণ করিব। আপনার কোন দাবী-দাওয়া থাকিবে না।”

আমি। আমি সম্মত আছি ; ইহাতে আমার অমত কিছুই নাই। এখন আপনার দুইটি প্রশ্ন কি বলুন।

তিনি। প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে এই—ঠিক কথা বলিবেন, গোপন করিলে কোন কাজই হইবে না—শশিভূষণ যে নির্দ্দোষ, এ কথা কি আপনি বিশ্বাস করেন ?

আমি। নিশ্চয়ই। আমি তাহার দুশ্চরিত্রতার জন্য তাহাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করে থাকি। যদি তাহাকে এই হত্যাপরাধে দোষী বলিয়া আমার মনে তিলমাত্র সন্দেহ থাকিত, তাহা হইলে তাহার মুক্তির জন্য একটি অঙ্গুলি সঞ্চালন করা দূরে থাক্ তখনই আমার হাত কাটিয়া ফেলিয়া দিতাম।

অক্ষয়। বটে। তার পর দ্বিতীয় প্রশ্ন এই—আপনি কি কেবল শশিভূষণ যাহাতে নিরপরাধ বলিয়া সপ্রমাণ হয়, তাহাই চাহেন ; না যাহাতে তাহার স্ত্রীর হত্যাকারীও সেই সঙ্গে ধরা পড়ে, তাহাও আমাকে করিতে হইবে ?

আমি। ক্ষমা করিবেন, আমি আপনার এ প্রশ্নের ভাবার্থ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

অক্ষয়। ইহাতে না বুঝিতে পারিবার কিছুই নাই ; একটু ভাবিয়া দেখিলেই বেশ বুঝিতে পারিবেন। এই আমিই আপনাকে বুঝাইয়া বলিতেছি ; কথাটা কি জানেন, প্রকৃত হত্যাকারীকে ধৃত করা বড় সহজ কাজ নহে। এবং আমি মনে করিলেই সে আসিয়া ধরা দিবে না ; বড় শক্ত কাজ—কোন নিরপরাধ লোকের স্বপক্ষে কয়েকটা প্রমাণ সংগ্রহ করা সে তুলনায় অনেক সহজ।

তাঁহার কথায় আমার একটু হাসি আসিল। আমি বলিলাম, "বুঝিয়াছি, আমি যে হাজার টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি, তাহা আপনি শশিভূষণকে নিরপরাধ সপ্রমাণ করিবারই পারিশ্রমিকের যোগ্য বিবেচনা করেন ; কিন্তু আমার যেরূপ অবস্থা, তাহাতে উহার বেশী আর উঠিতে পারিব না। তবে আমি এইমাত্র বলিতে পারি, হত্যা-

কারীকেই ধৃত করুন, বা শশিভূষণকেই উদ্ধার করুন, আপনি ঐ হাজার টাকা পাইবেন।"

অক্ষয়বাবু বলিলেন, "তা বেশ, পরে এই সব নিয়ে একটা গোল-যোগের সৃষ্টি করিবার অপেক্ষা আগে হইতে একটা ঠিকঠাক্ বন্দোবস্ত করিয়া রাখা ভাল। যাক্, আপনাকে আমার আর কিছু জিজ্ঞাসা করিবার নাই।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইহার চারিদিন পরে একদিন অক্ষয়কুমারবাবু নিজেই আমার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত। সে দিন যেন তাঁহাকে কেমন একটু রুষ্টভাবযুক্ত দেখিলাম। আমি কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই তিনি বলিলেন, "যা মনে করা যায়, তা ঠিক হয় না—কে জানে মহাশয়, টাকার লোভ দেখাইয়া আপনি এমন একটা ঝঞ্ঝাটে কাজ এই বুড়োটারই ঘাড়ে চাপাইবেন।"

আমি বলিলাম, "কেন, কি হয়েছে ? আপনাকে আজ যে বড় বিরক্ত দেখিতেছি।"

তিনি বলিলেন, "আরে মহাশয়, বিরক্ত, গায়ের রক্ত শুকাইলেই বিরক্ত হইতে হয়।"

আমি বলিলাম, "এই তিন-চারি দিনের মধ্যে আপনি কি কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারেন নাই ?"

অক্ষয়বাবু বলিলেন, "করিব কি আর মাথামুণ্ড! আমার ত খুব মনে লাগে, শশিভূষণ ঐ কাজ করে নাই; এটা খুবই সম্ভব। তাহা হইলেও শশিভূষণ কিন্তু ইহার ভিতরে আছে। তাহারই পরামর্শে এই হত্যাকাণ্ড হইয়াছে, এমন কি সে সময়ে শশিভূষণ উপস্থিতও ছিল।"

"আমি আপনার কথা ভাল বুঝিতে পারিলাম না। সম্ভব আপনি ইহার এমন কোন বিশিষ্ট প্রমাণ পাইয়া থাকিবেন।"

"প্রমাণ আর কি, একজন ত স্পষ্ট স্বীকার করিতেছে, শশিভূষণ সেইদিন রাত্রে যখন তাহার নিকটে বিদায় লইয়া আসে, তখন সে তাহার স্ত্রীকে হত্যা করিবে বলিয়া তাহার কাছে স্বীকার করিয়াছিল। এই কথা এখন আবার সে পুলিসের কাণেও দিতে চায়।"

আমি চমকিয়া উঠিলাম, বলিলাম, "কে সে ?"

অক্ষয়। সেই মোক্ষদা, এখন শশিভূষণ যাহার ঘাড়ে এই খুনের অপরাধটা চাপাইবার চেষ্টা করিতেছে। বোধ হয়, তুমি এখনও শোন নাই, সেই হত্যারাত্রে মোক্ষদাও শশিভূষণের বাড়ী পর্য্যন্ত তার পিছনে পিছনে এসেছিল।

আমি। কি আশ্চর্য্য! আপনি সেই মোক্ষদার কথা বিশ্বাস করিলেন ?

অক্ষয়। বিশ্বাস করা অভ্যাসটা আমার আদৌ নাই। সেটা পুলিস-কর্ম্মচারীদের বড় একটা আসেও না। তবে কি জানেন, সে যদি এখন সেই সব কথা প্রকাশ করিয়া দেয়, তাহা হইলে শশিভূষণের দোষটা আরও ভারী হইয়া উঠিবে। শশিভূষণকে বাঁচাইতে হইলে মোক্ষদার মুখটা আগে বন্ধ করা চাই।

আমি। তা কেমন করিয়া হইবে! এই সব পুলিসের হাঙ্গামে জড়াইবার ভয়ে যদি না সে নিজেই চুপ করে, তবে আমরা কোন্ উপায়ে তাহার মুখ বন্ধ করিব ?

অক্ষয়। টাকা—টাকা—টাকাতে সব হয়। নিশ্চয়ই কাজ উদ্ধার হইবে—এই সব নিয়ে দিনরাত মাথা ঘামিয়ে আমি মাথার সমুদায় চুল পাকাইয়া ফেলিলাম। আপনি এক কাজ করুন; আপনি নিজে গিয়ে তার সঙ্গে একবার দেখা করুন; কি করিলে এখন ভাল হয়, তখন আপনি সেটা নিজেই ঠিক করিতে পারিবেন।

আমি। আমি? মোক্ষদার সঙ্গে!

অক্ষয়। তাহা ভিন্ন আর উপায় কি ? তাহার নিজের মুখে এবং আপনার নিজের কাণে শুনিলে হয় ত আপনার মনের সন্দেহটা অনেকটা কাটিয়া যাইতে পারে। বলিতে কি, আমার মনে আপাততঃ আর কোনও সন্দেহ নাই—অনেকটা কৃতনিশ্চয় হইতে পারিয়াছি ; কিন্তু এ সময়ে যদি আপনি তাহার সহিত না দেখা করেন, কাজটা বড় ভাল হইবে না। এমন সময়ে আপনি যে ইহাতে আপত্তি করিবেন, তা আমি আগে একবারও মনে ভাবি নাই।

আমি সন্দেহোদ্বেলিত হৃদয়ে, জড়িতকণ্ঠে বলিলাম, "না—না, আমার আপত্তি কি—মোক্ষদার সহিত কোথায় দেখা করিতে হইবে ? তাহার বাড়ীতে ? সে কি আসিবে না ?

অক্ষয়কুমারবাবু ক্ষণেক এক মনে অবনতমস্তকে কি চিন্তা করিলেন। তাহার পর বলিলেন, "তাতে বোধ হয় সে রাজী হইবে না। আচ্ছা, আমি আর একটা উপায় দেখিব—আপনি এক কাজ করিবেন ; আমি বালিগঞ্জে একখানি নূতন বাগান কিনিয়াছি, সেই বাগানে কাল সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে একবার যাইবেন ; সেইখানে আমি মোক্ষদার সহিত আপনার দেখা করাইয়া দিব। কেমন ইহাতে আপনি সম্মত আছেন ? সেখানকার অনেকেই সে বাগান চেনে ; আমার নাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলে যে কেহ আপনাকে বাগানটা দেখাইতে পারিবে।"

আমি বলিলাম, "মোক্ষদা কি আপনার সে নূতন বাগানে যাইবে ?"

অক্ষয়বাবু বলিলেন, "এখন আমি কিরূপে সে কথা ঠিক করিয়া বলিব ? তবে যেমন করিয়া হউক, যাহাতে মোক্ষদাকে সেখানে লইয়া যাইতে পারি, সেজন্য বিশেষ চেষ্টা করিব। এ পর্য্যন্ত আমি কোন বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিয়া কখনও অকৃতকার্য্য হই নাই।"

আমি অক্ষয়কুমারবাবুর নূতন বাগানে প্রাগুক্ত নির্দ্দিষ্ট সময়ে যাইতে সম্মত হইলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন অপরাহ্ণে আমি বালিগঞ্জে গিয়া, অক্ষয়বাবুর নূতন বাগান অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিলাম। তখন সূর্য্যাস্তের স্বর্ণচ্ছায়া মিলাইয়া যাইতে আর বড় বিলম্ব ছিল না। পশ্চিম আকাশে দূরব্যাপী জলদ-পর্ব্বতান্তর্বর্ত্তিনী কনককিরণচ্ছটা কোন এক অপূর্ব্বদৃষ্টা মহীয়সী দেবী প্রতিমার মত হেমাচল-শিরে পদাঙ্গুষ্ঠের উপর ভর দিয়া সম্প্রসারিত দেহ এবং ঊর্দ্ধমুখ ঊর্দ্ধদৃষ্টি ও ঊর্দ্ধবাহু হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। এবং তাহার লাবণ্যোজ্জ্বল-দেহস্খলিত সোণালী অঞ্চল যেন প্রতিক্ষণে কম্পিত ও বায়ুচঞ্চল হইয়া উঠিতেছে। কি এক অপ্রত্যাশিতপূর্ব্ব বিপুল পুলকপ্লাবনে সমগ্র বিশ্ব ভরিয়া গিয়াছে। এবং বিশ্ব-পৃথিবীর অনন্ত জনপ্রাণী সেই বিরাট দৃশ্যের সম্মুখে স্তম্ভিত হইয়া আছে। আর আমার হৃদ্‌পিণ্ড ভেদ করিয়া একটা মর্ম্মাহত ব্যাকুল কাতরতা পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় বক্ষঃপঞ্জরে দুর্দ্দান্তবেগে প্রতিনিয়ত আঘাত করিতেছে। আজ মাতৃহৃদয়া শান্তিদেবী যেন চরাচর সমুদায় তাহার নিভৃত ক্রোড়ে টানিয়া লইয়াছে, আর সন্তাপদগ্ধ আমি সেই মাতৃস্বর্গ হইতে পৃথিবীর কোন অজানা দূরতম প্রদেশে একাকী স্খলিত হইয়া পড়িয়াছি।

আমি উদ্যানে প্রবিষ্ট হইয়াই দেখিলাম, অক্ষয়কুমারবাবু একটি ফ্ল্যানেলের চায়না কোট্ গায়ে দিয়া উদ্যানে পাদচারণা করিতেছেন। তাঁহার ভাবে তাঁহাকে বিশেষ কিছু চিন্তিত বোধ হইল। আমি তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইতেই তিনি আমার দিকে একটা চকিত দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "এই যে আপনি আসিয়াছেন, আমি আপনাকে ডাকিবার জন্য এইমাত্র লোক পাঠাইব, মনে করিতেছিলাম।"

আমি। আমি কি বড় বিলম্ব করিয়াছি ?

অক্ষয়। না, আপনি ঠিক সময়েই আসিয়াছেন।

আমি। মোক্ষদার কি হইল ?

অক্ষয়। সে অনেকক্ষণ আসিয়াছে।

এই বলিয়া অক্ষয়বাবু একটি দ্বিতল বাড়ীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশে আমাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, তন্মধ্যে তখন মোক্ষদা অবস্থান করিতেছে।

বাড়ীখানি উদ্যানের মধ্যে, আমরা যেখানে দাঁড়াইয়া কথোপকথন করিতেছিলাম, তাহার অদূরে। অক্ষয়বাবুর নূতন উদ্যানের মধ্যে সেই বাড়ীখানির অবস্থা নিতান্ত জীর্ণ এবং অত্যন্ত পুরাতন দেখিলাম। শরাহত ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ অভিমন্যুর ন্যায়,সেই ইষ্টকদন্তবিকশিত,মান্ধাতার সমসাময়িক অতি জীর্ণ বাড়ীখানাকে অগণ্য প্রোথিত বংশরথিবৃন্দপরিবেষ্টিত এবং তাহার চতুর্দ্দিকে চূণ সুরকী ও বালির প্রচুর ছড়াছড়ি দেখিয়া বুঝিলাম, সেই বহুদিনের পুরাতনকে এখন রাজমিস্ত্রীর সাহায্যে নবীকৃত করা হইতেছে। অক্ষয়বাবু আমাকে সেই বাড়ীর দিকে লইয়া চলিলেন।

উদ্যানস্থ অট্টালিকা যেরূপভাবে নির্ম্মিত হইয়া থাকে, ইহাও সেই ধরণের। সম্মুখে একটী বৃহৎ হলঘর এবং তাহার দুই পার্শ্বে কক্ষশ্রেণী। সমতল পৃথিবী হইতে গৃহতল প্রায় পাঁচ হাত উচ্চে। সেজন্য অলিন্দের দুইটি স্তম্ভের মধ্যবর্ত্তী হইয়া একটী সোপানশ্রেণী আছে। দেখিলাম, সেই নবসংস্কৃত সোপানাবলী সবে মাত্র বিলাতী মাটি দ্বারা আবৃত এবং মার্জ্জিত হইয়াছে। অক্ষয়বাবু পায়ের জুতা হাতে করিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন, আমিও তাঁহার দেখাদেখি জুতা খুলিয়া অতি সন্তর্পণে উঠিলাম; কিন্তু তাঁহার মত আমি ততটা সাবধান হইতে না পারায়, পায়ের চাপ লাগিয়া বিলাতী মাটি স্থানে স্থানে বসিয়া গেল। যদিও অক্ষয়বাবু তাহা দেখিয়াও দেখিলেন না; কিন্তু আমি মনে মনে কিছু অপ্রতিভ হইলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অক্ষয়বাবু সেই হলঘরের মধ্যে আমাকে লইয়া গিয়া, একটা চেয়ার টানিয়া বসিতে বলিলেন। আমি বসিতে তিনি বলিলেন, "আপনাকে অনর্থক কষ্ট দিলাম, যে রকম দেখিতেছি, কাজ কিছুই হইবে না। মোক্ষদা একেবারে মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে—সে কিছুতেই কর্ণপাত করে না। শশিভূষণের উপরে তাহার অত্যন্ত রাগ—শশিভূষণ তাহার অধঃপতনের মূল কারণ—শশিভূষণ পূর্ব্বকৃত অঙ্গীকার বিস্মৃত হইয়া তাহার অমতে বিবাহ করিয়াছে—তাহার সহিত ঘোরতর প্রবঞ্চনা করিয়াছে, এই সব কারণের জন্য শশিভূষণের উপরে মোক্ষদার নিদ্দারুণ ঘৃণা। এমন কি তাহাকেও যদি শশিভূষণের সহিত ফাঁসীর দড়িতে ঝুলিতে হয়—সোভি বহুৎ আচ্ছা। কিছুতেই সে নিরস্ত হইবার পাত্রী নয়। আপনি যে তাহাকে কোন রকমে বাগ মানাইতে পারিবেন, সে বিশ্বাস আমার আর নাই। দেখুন, চেষ্টা করিয়া দেখিতে ক্ষতি কি আছে। আমি তাহাকে পাঠাইয়া দিতেছি।" এই বলিয়া অক্ষয়কুমারবাবু উপরে উঠিয়া গেলেন।

অনতিবিলম্বে মোক্ষদা নামিয়া আসিল। আমি তাহাকে আর কখনও দেখি নাই। ইতিমধ্যে বর্ণনার দ্বারা অক্ষয়বাবু আমার ধারণাপটে মোক্ষদা-চিত্র যেভাবে অঙ্কিত করিয়াছিলেন, এখন মোক্ষদাকে প্রত্যক্ষ করিয়া এবং তাহার ভাবভঙ্গীতে ও গর্ব্বক্ষিপ্ত চরণ চালনায় তাহা যথার্থ বলিয়া অনুমিত হইল। পরে কথাবার্ত্তায় আরও বুঝিলাম, শশিভূষণ তাহার সহিত অত্যন্ত অসদ্ব্যবহার করায় সে অবধি সে তাহাকে অতিশয় ঘৃণা করে; সেই রাক্ষসী ঘৃণার নিকটে শশিভূষণের মৃত্যুটা তখন একান্ত প্রার্থনীয় হইয়া উঠিয়াছে। এমন কি আমি শশিভূষণের দিকে টানিয়া দুই-একটি কথা বলাতে তাহার দৃষ্টিতে আমার উপরেও যেন সামান্য ঘৃণার

লক্ষণ প্রকাশ পাইল। বোধ হয়, যদি শশিভূষণের হইয়া আমি আরও কিছু বাড়াবাড়ি করিতাম, তাহা হইলে সেই লক্ষণটা অনতিবিলম্বে তাহার মুখ দিয়া বর্ষিত হইতে দেখিতাম। তাহাতেই আমি বুঝিলাম, তাহার সেই ঘোরতর ঘৃণা তখন সীমাতিক্রম করিয়া একটা অদম্য ও অব্যর্থ ক্রোধে পরিণত হইয়াছে ; এবং তাহা একান্ত আন্তরিক এবং একান্ত অকপট। কিছুতেই মোক্ষদা বশীভূত হইবার নহে। তখন সে আমাদিগের চেষ্টার বাহিরে—অনেক দূরে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে অস্পৃশ্যা পতিতা বেশ্যা হইলেও তথাপি আমি তাহার দুটি হাতে ধরিয়া অনেক করিয়া বুঝাইলাম—অনেক চেষ্টা করিলাম। আশ্চর্য্য ! কিছুতেই আমি তাহার মতের একতিল পরিবর্ত্তন করিতে পারিলাম না। সে হাত ছাড়াইয়া সরিয়া দাঁড়াইল। এবং অতি দ্রুতপদে আমার দৃষ্টি-সীমার বহির্ভূত হইয়া গেল। দেখিলাম, বিপদ্ অনুত্তীর্য্য !

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মোক্ষদা চলিয়া গেলে অক্ষয়বাবু পুনরায় আমার কাছে আসিয়া বসিলেন। এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখনও কি আপনি শশিভূষণকে নির্দ্দোষ বলিয়া বিশ্বাস করেন ?" এই বলিয়া তিনি আমার মুখের দিকে একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

তাঁহার কথার ভাবে এবং দৃষ্টিপাতে বুঝিলাম, তিনি অন্তরালে দাঁড়াইয়া সকলই শুনিয়াছেন—সকলই দেখিয়াছেন। বলিলাম, "হাঁ, এখনও আমার বিশ্বাস, নিশ্চয়ই শশিভূষণ নির্দ্দোষ। আমার বিশ্বাস অভ্রান্ত। আপনি কি বিবেচনা করেন? আমার বোধ হয়, মোক্ষদার কথা সর্ব্বতোভাবে মিথ্যা। ইহাতে এমন—"

আমার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া তিনি বলিলেন, "কিছুই নাই

যাহা বিশ্বাস্য! বেশ, সেটা আমি আরও একবার ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিব ; ভাল বুঝি কেস্‌টা নিজের হাতে রাখিব—নয় ছাড়িয়া দিব। আপনি অপর কোন উপযুক্ত ডিটেক্‌টিভের সহিত বন্দোবস্ত করিবেন। যাক্‌ সে কথা, কাল আপনার বাড়ীতে কখন গেলে আপনার সহিত নিশ্চয়ই দেখা হইবে, বলুন দেখি।"

আমি। আপনি কখন যাইবেন, বলুন। সেই সময়ে আমি নিশ্চয়ই বাড়ী থাকিব।

অক্ষয়। বেলা তিনটার পর?

আমি। আচ্ছা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আমি অক্ষয়বাবুর নূতন বাগান হইতে বাহির হইয়া দেখিলাম, কে একটা লোক অনতিদূরস্থ একটা গাছের পার্শ্বে, তথাকার সীমাবদ্ধ ছায়ান্ধকার মধ্যে নিজেকে প্রচ্ছন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে। আমি সেদিকে আর দৃষ্টিপাত না করিয়া সেই তরুচ্ছায়াঘন সন্ধ্যাধূসর জনমানবশূন্য গৃহাভিমুখে চলিলাম।

কিছুদূরে আসিয়া আমি একবার পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলাম। দেখিলাম, সেই লোকটাই অনেক তফাতে আসিতেছে। একবার মনে একটু সন্দেহ হইল ; তাহার পর মনে করিলাম, হয় ত তাহারও এই গন্তব্য পথ। তাহার পর যখন আমি আমার বাটীর সম্মুখবর্ত্তী হইলাম, তখনও সেই লোকটাকে দেখিতে পাইলাম ; কিন্তু এবারে তাহাকে আমার পশ্চাতে দেখিলাম না। সে কখন কোথা দিয়া আসিয়া, আমাদের বাড়ী ছাড়াইয়া আরও তিন-চারি খানা বাড়ীর পরে একটা গলি পথের ধারে দাঁড়াইয়া আছে ; এবং আমার দিকে বিশেষরূপে লক্ষ্য করিতেছে। তখন বুঝিলাম, সে আমারই অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে। অবশ্যই

লোকটার একটা কোন উদ্দেশ্য আছে। সন্ধ্যার অস্পষ্ট অন্ধকারে যতদূর পারা যায় দেখিলাম—আকৃতি এবং বেশভূষায় তাহাকে ভদ্রলোক বলিয়া বোধ হয় না। ভদ্র বা ইতর যেই হোক—লোকটা কে ? লোকটার উদ্দেশ্য কি ?

সন্দেহে মনটা কিছু চঞ্চল হইয়া উঠিল। মনে করিলাম, তখন নিজের বাড়ীতে না যাইয়া, আরও খানিকটা এদিক-ওদিক করিয়া লোকটাকে তফাৎ করিয়া দিই। অনেক রকম দুর্ভাবনায় মনটা তখন অত্যন্ত পীড়িত ছিল ; সুতরাং মনের ইচ্ছা মনেই রহিয়া গেল। আমি দ্রুতপদে বাটীমধ্যে প্রবেশ করিলাম এবং পরক্ষণেই এ ক্ষুদ্র ঘটনা আমার মন হইতে একেবারে অপসৃত হইয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পরদিন বেলা ঠিক তিনটা বাজিবার মুখে অক্ষয়কুমারবাবু আমার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেদিন দেখিলাম, তিনি অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত এবং তাঁহার মুখ সহাস্য। দেখিয়া বোধ হইল, আজ যেন তিনি রাশি রাশি প্রয়োজনীয় সংবাদে কূলে কূলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছেন M. আমাকে সজোরে টানিয়া একটি চেয়ারে বসাইয়া বলিলেন, "বসুন মহাশয়, বসুন, ব্যস্ত হবেন না।" তাঁহার এরূপ আগ্রহ ও অভ্যর্থনায় বোধ হইল, যেন সেটি আমার বাড়ী নহে, আমিই তাঁহার সহিত দেখা করিতে তাঁহার বাড়ীতেই সমুপস্থিত হইয়াছি।

সে যাহাই হউক, আমি উত্তেজিতকণ্ঠে বলিলাম, "এবার বোধ হয়, আপনি এ কেস্‌টার একটা কিছু কিনারা করিতে পারিয়াছেন।"

তিনি বলিলেন, "হাঁ, সাহস করে বল্‌তে পারি, এখন কেস্‌টাকে ঠিক আমার মুঠোর ভিতরে আনিতে পারিয়াছি। বড়ই আশ্চর্য্য ব্যাপার!

আমার মত বিচক্ষণ ডিটেক্‌টিভের হাতে যত কেস্ আসিয়াছে, একটি ছাড়া এমন অত্যাশ্চর্য্য কোনটিই নহে। যে বয়স আমার, তা'তে 'বিচক্ষণ' বিশেষণটায় আমার কিছু অধিকারও থাকিতে পারে, কি বলেন ? (হাস্য) কাল মোক্ষদার সহিত আপনার কথাবার্ত্তায় কেস্‌টা একেবারে পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। আর কোন গোল নাই। বলিতে কি মোক্ষদা মেয়েটি ভারি ফিচেল্—ভারি চালাক, এমন সে ভাণ করিতে পারে, ঠিক হুবহু। যদি তাকে কোন থিয়েটারে দেওয়া যায়, সে শীঘ্রই একটি বেশ নামজাদা অ্যাক্‌ট্রেস্ হতে পারে।"

আমি শ্রুতিমাত্র বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "কেন, কাল আপনি বল্‌ছিলেন, যে——"

বাধা দিয়া অক্ষয়বাবু বলিলেন, "কি আপদ! কল্যকার কথা আজ কেন ? ব্যস্ত হবেন না—আমি যা বলি, তা মন দিয়া শুনুন। আপনাদের নব্য বয়স, রক্ত গরম—সুতরাং ধৈর্য্যটি অত্যন্ত কম। কাল যদি আপনাকে সমুদায় প্রকৃত কথা ভাঙিয়া বলিতাম, তাহা হইলে আপনি হয় ত আমার শ্রম পণ্ড করিয়া ফেলিতেন। মোক্ষদা মেয়েটি ভারি চালাক—যতদূর হইতে হয়। এই বলিয়া তিনি সুখ্যাতিবাদের আবেগে নিজের হস্তে হস্ত নিষ্পীড়ন করিতে লাগিলেন।

আমি ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মোক্ষদা হইতে কি আপনি এ খুন-রহস্যের কোন সূত্র বাহির করিতে পারিয়াছেন ?"

অক্ষয়কুমারবাবু বলিলেন, "দেখুন যোগেশবাবু, আপনার কথাটাই ঠিক। এই হত্যাকাণ্ডে শশিভূষণের কিছুমাত্র দোষ নাই। আরও একটা কথা—কি জানেন, হত্যাকারী শশিভূষণকে খুন করিতে গিয়া ভ্রমক্রমে লীলাকে খুন করিয়াছে।"

আমার মস্তিষ্কের ভিতর দিয়া বিদ্যুতের একটা সুতীব্র শিখা সবেগে সঞ্চালিত হইয়া গেল ; আমি অত্যন্ত চমকিত হইয়া উঠিলাম !

অষ্টম পরিচ্ছেদ

অক্ষয়কুমারবাবু বলিতে লাগিলেন, "স্থির হন, ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। শশিভূষণের কোন দোষ থাক্ বা না থাক্, সে এখন আর এ জগতে নাই, সে কাল রাত্রে হাজত ঘরেই আত্মহত্যা করিয়াছে। বোধ হয়, আপনি জানেন, শশিভূষণের শয়ন-গৃহটি দক্ষিণ দিকের সরু গলিটার ধারেই। একটি অনতি-উচ্চ প্রাচার এবং কয়েকটি বড় বড় ফলের গাছ ব্যবধান মাত্র। শশিভূষণের শয়ন-গৃহে দুইটি শয্যা ছিল। একটিতে লীলা তাহার শিশু-পুত্রকে লইয়া শয়ন করিত, অপরটিতে শশিভূষণ একাকী শয়ন করিত। যে রাত্রে লীলা খুন হয়, সে রাত্রে মোক্ষদার বাড়ীতে শশিভূষণ যায় নাই—সেইজন্য মোক্ষদা রাত্রে চুপি চুপি শশিভূষণের বাড়ীতে আসিয়াছিল। সেদিন শশিভূষণ অত্যন্ত বেশী মদ খাইয়াছিল; সেই ঝোঁকে শয়ন-গৃহে গিয়া লীলাকে অত্যন্ত প্রহারও করিয়াছিল। সে রাত্রে তাহাদের ঐ গলির দিকের একটি জানালা খোলা থাকায় সেই গলিতে দাঁড়াইয়াও ঘরের সেই সব ব্যাপার দেখিবার বেশ সুযোগ ছিল। যাক্, তাহার পর শশিভূষণ একটি বিছানায় শুইয়া, মদের ঝোঁকে খানিকটা এপাশ-ওপাশ করিয়া নিদ্রিত হইল। এবং লীলাও তাহার খানিকটা পরে ঘুমাইয়া পড়িল। তাহার একঘণ্টা পরেই হত্যাকারী সেই গলিপথ দিয়া প্রাচীর, বৃক্ষ এবং উন্মুক্ত গবাক্ষের সাহায্যে সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া লীলাকে হত্যা করে। পরে পুনর্ব্বার উন্মুক্ত বাতায়ন পথ দিয়া নামিয়া যায়। তখন লীলার স্বামী মদের ও নিদ্রার ঝোঁকে একেবারে সংজ্ঞাশূন্য। যোগেশবাবু, আমার কথা আপনার বড় আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইতেছে, বোধ হয়; কিন্তু ইহার একটি বর্ণও মিথ্যা নহে—আমি এ সম্বন্ধে অনেক

প্রমাণ পাইয়াছি। আপনার এ কেস্ হাতে লইয়া প্রথমে আমি শশিভূষণের পারিবারিক বৃত্তান্তগুলি জানিতে চেষ্টা করি। তা সে চেষ্টা যে একেবারে বৃথা গেছে, তাহা নহে। তাহাতেই জানিতে পারি যে, শশিভূষণের দুইটি বিছানা ছিল। একটি বড়—সে বিছানায় লীলা তাহার ছোট ছেলেটিকে লইয়া শয়ন করিত। আর যেটি ছোট, সেইটিতে শশিভূষণ নিজে শয়ন করিত। তাহাদের এক বিছানায় না শয়ন করিবার কারণ, শশিভূষণ অনেক রাত্রে মদ খাইয়া আসিত, যতক্ষণ না ঘুম আসিত, ততক্ষণ পড়িয়া পড়িয়া সে ছট্ ফট্ করিত। সেরূপ অবস্থায় আরও দুইটি প্রাণীর সহিত একত্র শয়ন করা সে নিজেই অসুবিধাজনক বোধ করিয়া এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিল। বিশেষতঃ নিত্য মধ্যরাত্রে পার্শ্ববর্ত্তী শিশুপুত্রের তীব্রতম উচ্চ ক্রন্দনে বারত্রয় তাহার সুনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিবারও যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। সেদিন প্রাতঃকালে সকলেই লীলার মৃতদেহ তাহার স্বামীর বিছানায় থাকিতে দেখিয়াছিল। সেই সূত্র অবলম্বনে আমি দুইটি অনুমান করিতে পারিয়াছি। প্রথম অনুমান—সেদিন রাত্রে শশিভূষণ বেশী মদ খাইয়াছিল, তেমন খেয়াল না করিয়া ঝোঁকের মাথায় ভ্রমক্রমে তাহার স্ত্রীর বিছানায় শুইয়াছিল, এবং অনতিবিলম্বে সেইখানেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। লীলা স্বামীকে নিদ্রিত দেখিয়া এবং তদবস্থ স্বামীর নিদ্রাভঙ্গ করা অনুচিত মনে করিয়া, নিজের ছেলেটিকে লইয়া অপর বিছানায় শয়ন করিয়াছিল। দ্বিতীয় অনুমান—এমন সময়ে কেহ গবাক্ষদ্বার দিয়া সেই অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল। সম্ভব, সে এই দম্পতীর এই অপূর্ব্ব শয়ন-ব্যবস্থা পূর্ব্ব হইতেই জানিত; সুতরাং অন্ধকারে কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া স্বামীর পরিবর্ত্তে স্ত্রীকে হত্যা করিয়াছে। এই দুইটি অনুমানের যথেষ্ট প্রমাণও আমি সংগ্রহ করিয়াছি। তখন তাহাদের শয়ন-গৃহে যে অপর কেহ গোপনে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ—সেই গলিটার পাশে প্রাচীরের উপরে আমি দুই-তিনটি অস্পষ্ট পদচিহ্ন এবং নীচে গলির ধারে অনেকগুলি

সেই পদচিহ্ন সুস্পষ্ট দেখিয়াছি। সেখানে অনেক গাছ-পালা এবং পাশেই আবার শশিভূষণের দ্বিতল অট্টালিকা; সুতরাং সেই গলির ভাগ্যে রৌদ্রস্পর্শ সুখ বহুকাল ঘটে নাই। সেইজন্য সেখানকার মাটি এত স্যাঁতসেঁতে যে, অনতিশুষ্ক কর্দ্দম বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাহাতে সেই কাহারও পায়ের দাগগুলি সেখানে সুগভীর ও বেশ পরিষ্কার অঙ্কিত হইয়াছিল। পরে অনেক কাজে লাগিবে স্থির করিয়া আমি সেই সকল পদচিহ্নের মধ্যে যেগুলি অধিকতর গভীর এবং নিখুঁত, সেইগুলির উপরে গাছের কতকগুলা শুষ্ক পাতা কুড়াইয়া আগুন ধরাইয়া সেই পদচিহ্নগুলি বেশ শুষ্ক হইয়া আসিলে আমি ময়দা দিয়া একটি ছাপ তুলিয়া লই। সেই মাপেরই অতি অস্পষ্ট পদচিহ্ন শশিভূষণের শয়ন-গৃহের গবাক্ষের বাহিরে আলিসার উপরেও দুই-একটা দেখিয়াছি। আমার কথায় আপনার একটু সন্দেহ হইতে পারে যে, হত্যাকারী সেই অনতি-উচ্চ প্রাচীর হইতে একেবারে কি করিয়া সেই অত্যুচ্চ দ্বিতলে উঠিল; কিন্তু সে সন্দেহ আমি রাখি নাই। হত্যাকারী সেইখানকার একটা জামের গাছ অবলম্বন করিয়া উঠিয়াছিল। সেই জামগাছের গুঁড়ির কিছু উপরে কতকগুলি খুব ছোট নধর শাখা অঙ্কুরিত হইয়াছিল। তা নামিবার সময়ে হউক বা উঠিবার সময়েই হউক হত্যাকারীর পা লাগিয়া, সেগুলার কতক ভাঙিয়া মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিল, কতক গাছেই ঝুলিতেছিল। এই সকল প্রমাণে এই হত্যাকাণ্ডের ভিতরে যে আর একজন কাহারও অস্তিত্ব আছে—সে সম্বন্ধে আমি একেবারে নিঃসন্দেহ এবং আপনার মতের সহিত একমত হইতে পারিয়াছি। শশিভূষণ সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। আমি যাহা বলিলাম, আপনি কি এখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন ?”

এইরূপ জিজ্ঞাসাবাদের পর তিনি আমার উত্তরের জন্য ক্ষণমাত্র অপেক্ষা না করিয়া তন্ময়চিত্তে বলিতে লাগিলেন, “মোক্ষদা মেয়েটা ভারি চালাক—যতদূর হতে হয়—ওঃ! বেটি কি বুদ্ধিমতী, সাবাস্ মেয়ে যা হক!”

আমি তাঁহার সেই তন্ময়তার মধ্যে একটু অবসর পাইয়া বলিলাম, "ও হরি! আপনি তাহা হইলে এখন সেই মোক্ষদাকে দোষী ঠিক——"

বাধা দিয়া, আমার মুখের দিকে ক্ষণমাত্রস্থায়ী একটা বিরক্তিব্যঞ্জক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সহাস্যমুখে বলিলেন, "মোক্ষদা? তাও কি সম্ভব! এ কি কাজের কথা? আপনি অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠিয়াছেন দেখিতেছি—আপনি আমার নিযোক্তা—আপনার কাছে কথাটা আর অধিকক্ষণ গোপন রাখা ঠিক হয় না। অন্য আর প্রমাণ দেখাইবার কোন আবশ্যকতা নাই—আমি একেবারে হত্যাকারীকে আপনার প্রত্যক্ষ করাইয়া দিতেছি।"

বলিতে বলিতে অক্ষয়কুমারবাবু উঠিলেন। ক্ষিপ্রহস্তে পথের দিক্‌কার একটি জানালা সশব্দে খুলিয়া ফেলিলেন। এবং জানালার সম্মুখভাগে ঝুঁকিয়া কাহাকে লক্ষ্য করিয়া বংশীধ্বনি করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

নিদারুণ উৎকণ্ঠায় আমার আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল এবং দৃষ্টির সম্মুখে সর্ষপ-কুসুম নামক বিবিধ-বর্ণ-বিচিত্র ক্ষুদ্র গোলকগুলি নৃত্য করিয়া উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল।

ক্ষণপরে দুইটি লোক সেই ঘরে প্রবেশ করিল। একজনকে দেখিবামাত্র পুলিস-কর্ম্মচারী বলিয়া চিনিতে পারিলাম। আর তাহার পাশের লোকটি সেই-ই- গত রাত্রে যে বালিগঞ্জের পথ হইতে আমার বাড়ী পর্য্যন্ত আমার অনুসরণে আসিয়াছিল।

সেই লোকটির প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া অক্ষয়কুমারবাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি এই লোকটিকে চিনিতে পারেন?"

আমি বলিলাম, "হাঁ, যখন আমি আপনার বাগান হইতে বাড়ী ফিরিতেছিলাম, তখন এই লোকটি আমার বাড়ী পর্য্যন্ত আমার অনুসরণ

করিয়া আসিয়াছিল; কিন্তু তাহার পূর্ব্বে ইহাকে আর কখনও দেখি নাই।"

অক্ষয়কুমারবাবু বলিলেন, "না দেখিবারই কথা। আমারই আদেশে এই লোক আপনার অনুসরণ করিয়াছিল।" এই বলিয়া তিনি বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া নবাগতদ্বয়কে বলিলেন, "তোমাদের ওয়ারেণ্ট বাহির কর, ইঁহারই নাম যোগেশবাবু—ইনিই লীলার হত্যাকারী।"

কথাটা শুনিয়া বজ্রাহতের ন্যায় আমি সবেগে লাফাইয়া উঠিয়া দশ পদ পশ্চাতে হটিয়া গেলাম। এবং তেমন মধ্যাহ্ন-রৌদ্রোজ্জ্বল দিবা-লোকেও উন্মীলিত চক্ষে চতুর্দ্দিকে অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। এই বিশ্বজগতের সমুদায় শব্দ কোলাহল আমার কর্ণমূলে যুগপৎ স্তম্ভিত হইয়া গেল। গাঢ়তর—গাঢ়তর—গাঢ়তর অন্ধকারে চারিদিক ব্যাপিয়া ফেলিল। কতক্ষণ পরে জানি না—প্রকৃতিস্থ হইয়া দেখিলাম, অয়স্কঙ্কনে আমার হস্তদ্বয় শোভিত এবং সন্নিবদ্ধ হইয়াছে। অক্ষয়বাবু বলিতেছেন, "যোগেশবাবু, আপনার জন্য আমি দুঃখিত হইলাম। কি করিব? কর্ত্তব্য আমাদিগের সর্ব্বাগ্রে! আপনি জানিয়া-শুনিয়াও এইমাত্র মোক্ষদার স্কন্ধে নিজের অপরাধটা চাপাইতেছিলেন? তাহাতে আপনাকে বড় ভাল লোক বলিয়া বোধ হয় না। সে যাহা হউক, যেদিন আপনি আমার সহিত প্রথম দেখা করেন, সেইদিন আপনার মুখে হত্যাবৃত্তান্ত শুনিবার সময়েই আমি কোন সূত্রে আসল ঘটনাটা ঠিক বুঝিতে পারিয়া-ছিলাম। সেইজন্যই আপনার দেয় পুরস্কারের হাজার টাকাএকটি দস্তুরমত লেখাপড়া করিয়া কোন ভদ্রলোকের মধ্যস্থতায় জমা রাখিতে বলি। আপনিও তাহা রাখিয়াছেন। আর আপনিও জানেন, শুধু হাত কখন কাহারও মুখে ওঠে না। সে যাহাই হউক, ইহাতেই আপনার হৃদয়ে একটা মহৎ উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়, শশিভূষণ আপনার ঘোরতর শত্রু হইলেও সে যে নিরপরাধ, তাহা আপনি অন্তরে জানিতেন।

আপনার অপরাধে যে তাহাকে দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে, এই ভাবিয়া আপনার যথেষ্ট অনুতাপ হইতেই এই হাজার টাকা পুরস্কারের সৃষ্টি। এখন দুই-চারিটি প্রমাণ দেখাইয়া দিলে, আপনি যে একটা অর্ব্বাচীনের হাতে কেস্‌টা দেন নাই, সে সম্বন্ধে আপনার আর কোন সন্দেহ থাকিবে না। যেদিন লীলা খুন হয়, সেইদিন রাত দশটার সময়ে বাগানে আপনার সঙ্গে শশিভূষণের খুব একটা রাগারাগী হয়। এবং তাহাকে খুন করিবেন বলিয়া আপনি উচ্চকণ্ঠে শাসাইয়াছিলেন। অবশ্যই আপনার সেই উচ্চকণ্ঠের শাসনগুলি সেই সময়ে শশিভূষণ ছাড়া আরও দুই-একজনের শ্রুতিগোচর হইয়াছিল। ইহার কিছুক্ষণ পরে শশিভূষণ তাহার ছুরি চুরির কথা জানিতে পারে। শশিভূষণকে না বলিয়া সেই ছুরিখানি আপনি লইয়াছিলেন। আপনার এই 'না-বলিয়া ছুরি-গ্রহণ' সম্বন্ধে আমি দুই-একটা প্রমাণও সংগ্রহ করিয়াছি। সেদিন শশিভূষণের তীক্ষ্ণতর কটুক্তিতে আপনার রক্ত নিরতিশয় উষ্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। আপনি বাড়ীতে ফিরিয়াও নিজেকে কিছুতেই সাম্‌লাইতে পারেন নাই; আপনি শশিভূষণকে হত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া পুনরায় তাহার বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। এবং আপনার মাথায় হঠাৎ কি একটা প্ল্যান্ উদ্ভব হওয়ায়, আসিয়াই বৈঠকখানা ঘর হইতে ছুরিখানা 'না-বলিয়া-হস্তগত-করা' নামক পাপে লিপ্ত হইয়া আসেন। তখন একজন পরিচারিকা আপনাকে দেখিয়াছিল। আপনি ভদ্রলোক, সে ছোটলোক—সুতরাং তখন সে আপনার উপরে এরূপ একটা গর্হিত সন্দেহ করিতে পারে নাই। এদিকে যখন এইরূপ দুই-একটি ক্ষুদ্র ঘটনা আরম্ভ ও সমাপ্ত হইয়া গেল, তখনও শশিভূষণ সেই বৈঠকখানার ছাদে বসিয়া মদ খাইতে-ছিল। উদ্যানে আপনাদের সেই বাগ্বিতণ্ডার পরে আপনি যখন চলিয়া গেলেন—কোন দুর্জ্ঞেয় কারণে শশিভূষণের মনে একটা বড় অসাচ্ছন্দ্য উপস্থিত হয়। এবং সেই অস্বাচ্ছন্দ্য দূর করিবার জন্য সে আবার

বৈঠকখানার ছাদে উঠিয়া মদ্যপান আরম্ভ করিয়া দেয়। মদেই লোকটার মাথা খাইয়া দিয়াছিল। যতটা পারিল, বসিয়া বসিয়া খাইল। তাহার পর বাকিটা বোতলের মুখে ছিপি আঁটিয়া যখন বৈঠকখানা ঘরের আলমারীতে রাখিতে যায়—তখন দেখে আলমারী খোলা রহিয়াছে এবং ছুরিখানা সেখানে নাই। দেখিয়া প্রথমে একটু চিন্তিত হইল। তাহার পর দুই-একবার এদিক-ওদিক খুঁজিয়া না পাইয়া বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। এবং লীলাকে ছুরির সহসা অদৃশ্য হওয়ার কথা বলিল। সেই সময়ে তাহার শয়ন-গৃহের পার্শ্বস্থ গলিপথে মোক্ষদা কোন লোককে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছিল। মোক্ষদাকে আমি সেই লোকের নাম জিজ্ঞাসা করায় সে বলে তাহাকে সে চেনে না, পূর্ব্বে কখনও দেখে নাই। তখন আমি একটা কৌশল করিয়া আপনাকে তাহার সম্মুখে নিয়ে যাই; আপনি তাহার মুখে তখন যে সকল কথা শুনিয়াছিলেন, তাহা ভাণমাত্র; আমিই তাহাকে এইরূপ একটা অভিনয় দেখাইতে শিখাইয়া দিয়াছিলাম। যাহা হউক, মোক্ষদা আপনাকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারে। তখন রহস্যটা অনেক পরিষ্কার হইয়া আসিল। তাহা হইলেও কেবল মোক্ষদার কথায় আমি বিশ্বাস করি নাই—সেটা ডিটেক্‌টিভ-দিগের স্বধর্ম্মও নহে। আর যাহা হউক, সেই প্রাচীরের পার্শ্ববর্ত্তী পদচিহ্নগুলি মিলাইয়া দেখিবার একটা সুযোগ সেই সঙ্গে ঠিক করিয়া লই। সেইজন্য আপনাকে আমার বাগানবাড়ীতে লইয়া যাই। বাগানবাড়ীতে গিয়া হল্ ঘরে যাইতে সবে-মাত্র-বিলাতীমাটি-দেওয়া সোপানে নগ্নপদে অতি সন্তর্পণে উঠিতে হয়। তাহাতে সেই সদ্যোমার্জ্জিত বিলাতীমাটিতে আপনার পায়ের যে দাগ পড়ে, আমি সেইগুলির সহিত ময়দার ছাপে তোলা সেই গলি পথের দাগগুলি মিলাইয়া বুঝিতে পারি—সকলই এক পায়ের চিহ্ন এবং সেই পা মহাশয়েরই।" এই বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং নিজের

হস্তাবমর্ষণ করিতে করিতে অতি উৎসাহের সহিত বলিতে লাগিলেন, "মোক্ষদা বেটি ভারি চালাক—ভারি বুদ্ধিমতী—সাবাস মেয়ে যা হোক —যতদূর ফিচেল হতে হয়। কি জানেন, যোগেশবাবু, তাহা হইলেও আমি মোক্ষদার উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারি নাই। আপনাদের সহিত সাক্ষাৎকালে সে যদি আমার কথা আপনাকে বলিয়া দিয়া থাকে, যে আমি আপনাকে ফাঁদে ফেলিবার চেষ্টা করিতেছি; অথবা আপনি কৌশলে তাহার মুখ হইতে কোন কথা বাহির করিয়া লইয়া আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া থাকেন, এই আশঙ্কা করিয়া আমি এই লোককে তখন আপনার বাড়ী পর্য্যন্ত আপনার অনুসরণ করিয়া দেখিতে বলিয়াছিলাম। আপনি বাড়ীতে যান, কি আর কোথাও যান—কি করেন, আপনার মুখের ভাব কি রকম, এই সব লক্ষ্য করিতে বলিয়া দিয়াছিলাম। যখন আপনি বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন, এই লোক তাহার পর আপনার বাড়ীর সম্মুখে দুই ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া যখন আর আপনাকে বাহিরে আসিতে দেখিল না—তখন নিশ্চিন্ত মনে ফিরিয়া আসিয়া আমাকে সংবাদ দিল। তাহার পর আপনার নামে আজ ওয়ারেণ্ট বাহির করিয়া আমার কর্ত্তব্য নিষ্পন্ন করিলাম। বলিতে কি, অনেক খুনের কেস্ আমার হাতে আসিয়াছে, তার মধ্যে একটা ছাড়া এমন অদ্ভুত কোনটাই নয়। যাহা হউক, এখন বুঝিলেন, শশিভূষণ নিরপরাধ এবং হত্যাকারী কে?"

দশম পরিচ্ছেদ

আর কি বলিব ? আর কি বলিবার আছে ? হে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ ! এ দুর্ভাগ্যের হৃদয়ের কথা তুমি সব জান, প্রভো ! যাহাকে আমি প্রাণের অধিক ভালবাসিতাম, তাহাকে একজন নৃশংসের হাতে এইরূপ উৎপীড়িত ও অত্যাচারিত হইতে দেখিয়া আমার হৃদয়ে কি বিষের দাহন আরম্ভ হইয়াছিল, তুমি সব জান, প্রভো ! সেদিন যদি আমার সেই ভুল না হইত, যদি আমি ঠিক শশিভূষণকে হত্যা করিতে পারিতাম, তাহা হইলে বোধ হয়, সুখে মরিতে পারিতাম। লীলাকে একজন নররাক্ষসের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া মনে করিতে পারিতাম, আমার মৃত্যুতে একটা কাজ হইল। হায় ! মানুষ যাহা মনে করে, তাহার কিছুই হয় না ! সেই সর্ব্বশক্তিমানের অঙ্গুলি হেলনে সমগ্র বিশ্ব সমভাবে শাসিত হইতেছে, সেখানে মানুষ মানুষের কি বিচার করিবে ? তাঁহার এমনই রচনা কৌশল—পাপী নিজের হাতেই স্বকৃত পাপের দণ্ডবিধান করিয়া থাকে।

দুগ্ধপোষ্য অপরিস্ফুটবাক্ শিশু ব্যাঘ্র-কবলিত হইলে যেমন সে প্রথমে নিজের বিপদ্ বুঝিতে পারে না, বরং যতক্ষণ ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক কোনরূপে পীড়িত না হয়, ততক্ষণ তাহার উল্লম্ফন, ভীষণোজ্জ্বল চক্ষু এবং দীর্ঘ লাঙ্গুলান্দোলনে বরং সেই শিশুর বিরলদন্ত মুখে, নধর অধরপুট দিয়া কল্লোলিত শুভ্রহাস্যস্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে। হায় ! স্বপ্নাবিষ্ট আমরাও তেমনি এই দুঃখদারিদ্র্যভীষণ শোকতাপপূর্ণ, বিপদসঙ্কুল কঠিন সংসারের বক্ষঃশায়িত হইয়া কোন্ অজ্ঞাত মোহে অবিশ্রাম হাস্য-তরঙ্গে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে থাকি ! তাঁহার পর যখন কোন অপ্রতিহত দুর্দ্দান্ত আঘাতে স্বপ্ন ভাঙিয়া যায় এবং মোহ ছুটিয়া যায়, তখন নিরবলম্বন এবং আশা-ভরসা-শূন্য হইয়া, হৃদয় শতধা বিদীর্ণ করিয়া উচ্চকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠি।

উপসংহার

আমার কথা

যোগেশের এই মর্ম্মস্পর্শী আত্মকাহিনী যখন শেষ হইল—তখন চকিতে চাহিয়া দেখি, বহির্জগৎ প্রভাতের কোমল আলোকে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। আমি তাহার কাহিনীতে এমনই মগ্ন এবং তন্ময় হইয়া গিয়াছিলাম যে, এ সব কিছুই জানিতে পারি নাই। আমি তাড়াতাড়ি আর একটি চুরুট ধরাইয়া উঠিয়া পড়িলাম। এমন সময়ে একজন প্রহরী সশব্দে কারাদ্বার উন্মোচন করিয়া ফাঁসির আসামী হতভাগ্য যোগেশ-চন্দ্রের শেষ আহার্য্য-হস্তে আমাদের সম্মুখীন হইল। তাহার এক ঘণ্টা পরে সকলই ফুরাইল—যোগেশচন্দ্রের নাম এ জগতের জীবিত মনুষ্যের তালিকা হইতে চিরকালের জন্য মুছিয়া গেল! হতভাগ্য ফাঁসি-কাষ্ঠে আপনার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিল।

পাঠক! আমি আজ বত্রিশ বৎসর এই জেলখানায় কাজ করিতেছি; কিন্তু এমন শোচনীয় ব্যাপার আমার আমলে আর কখনও ঘটে নাই। সেইদিন হইতে যেন নিজের ও নিজের কারাধ্যক্ষ পদটার উপরে আমার একটা বিজাতীয় ঘৃণা বোধ হইতে লাগিল। আশা করি, পতিতপাবন ঈশ্বর, ভ্রান্ত পতিত যোগেশচন্দ্রের পরলোকগত আত্মার শান্তি বিধান করিবেন।

জনৈক কারাধ্যক্ষ